ইউনিট
১৮

বৌদ্ধধর্ম

'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। এ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের শাক্য রাজবংশের যুবরাজ সিদ্ধার্থ এই জ্ঞানালঙ্কারে অভিষিক্ত হয়েই জগতে বুদ্ধ হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন 'হি ভিশুগণ! তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, বহু জনের কল্যাণের জন্য বঙ্গজনে মুখের জন্য, শান্তি্র জন্য, চতুর্দিকে বিচরণ করো। আমরা এমনধর্ম প্রচার করো যার কাদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ। তার মনে ছিল মানব প্রেম, যা সকলের জন্য মানবিক অবদান পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর।

কুমার সিদ্ধার্থ আজই হাজার বছরেরও পূর্বে নেপালের লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম রানী মহামায়া। নামকরণ দিবসে তাঁর নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ। জন্মের সপ্তাহকাল পরেই তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন তাঁর মাসী (মায়ের বোন) মহাপ্রজাপ্রতি গৌতমী। গৌতমীর লালনকৃত সন্তান বলে তাঁকে গৌতমও বলা হয়। শাক্যবংশ জন্ম বলে শাক্য সিংহ নামেও তিনি পরিচিত। জন্মের পর জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সন্তান গৃহত্যাগী হয়ে বুদ্ধ হবেন অথবা সংসারী হয়ে রাজচক্রবর্তী রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করবেন। কিন্তু সংসার ত্যাগের সম্ভাব্য বিষয়ে রাজা চিন্ড়িত হয়ে পড়েন। এ জন্য রাজা শুদ্ধোদন কুমার সিদ্ধার্থকে যথাসময়ে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা যশোধরা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করালেন। কুমার সিদ্ধার্থের পুত্র সন্ড়ান রাহুল জন্মগ্রহণ করলে তাঁকে ভাবিয়ে তোলেন। এ সময় মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন অন্যান্য পরিজন এবং ভোগ বিলাসের অফুরন্ড় উপাদানকে তুচ্ছ মনে করে তাঁর হৃদয়-মন উদ্বেলিত হয় এক অনন্য চেতনায়। এ নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য বছর বয়সে জীবনকে প্রধানব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর ছয় বছর কঠোর সার্ধনা করে বোধজ্ঞান লাভ করেন এবং আশি বছর বয়সে মহাপরিনির্বা লাভ করেন। তাঁর জীবন-দর্শন মানববিদ্যার পঠন-পাঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ-১ : চারি আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি

- চতুরার্য সত্য কি বলতে পারবেন।
- আর্যসত্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- আর্যসত্যের শ্রেণী বিভাজন বলতে পারবেন।
- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিশুদ্ধ জীবনগঠনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভূমিকা বলতে পারবেন।

চতুরার্য সত্যের পরিচয়

জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখময়। প্রতি নিয়ত মানুষ অতৃপ্ত বাসনা, শোক, বিলাপ প্রভৃতি নিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বৌদ্ধ মতে, তৃষ্ণা হেতু মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করা খুবই দুঃখকর। এ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় জন্ম-জন্মান্ড়রে পারশী পূরণ করেন। অবশেষে তিনি তৃষ্ণা মুক্তির পরমসত্য জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধত্বে উন্নীত হন। অন্যতম পথ হিসেবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সন্ধান লাভ করেন। এটি চার ভাগে বিভক্ত যা চারি আর্যসত্য নামে পরিচিত। এ চারি আর্যসত্যকে বৌদ্ধধর্ম কিংবা বৌদ্ধদর্শনের উপক্রমণিকা বলা হয়। এগুলোই হলো বুদ্ধের ধর্মদর্শনের মূল চাবিকাটি। মানুষকে চারটি সত্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ করাই হলো বুদ্ধের মহান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আর্যসত্যের সংজ্ঞা

আর্যসত্যের শব্দগত অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ সত্য। আর্যগণের জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দৃষ্ট যে সত্য তার নাম আর্যসত্য। যিনি ক্ষমাশীল, শত্রুহীন ও নির্ভীক তিনিই আর্য। যিনি সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন তিনিই আর্য। কিন্তু এখানে 'আর্য' বলতে বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধগণকে বোঝায়। কারণ তাঁরা জ্ঞানযোগে আর্যসত্যকে দর্শন করে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়েছেন। অর্থাৎ তারা নির্বাণ অধিগত হয়েছেন। এখানে বিশেষ অর্থে বুদ্ধ যে শ্রেষ্ঠসত্য দেশনা করেছেন তাকে আর্যসত্য বলা হয়।

আর্যসত্যের শ্রেণী বিভাজন

জগৎ সংসারে নিত্য বলতে কিছুই নেই। লোভ দ্বেত্ত মোহে আসক্ত মানুষ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে দুঃখকে সুখ মনে করে প্রতিনিয়ত কষ্ট পায়। আর প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জন্মচক্রে আবর্তিত হচ্ছে বারবার। অন্যদিকে যাঁরা প্রজ্ঞাবান তাঁরা দুঃখকে দুঃখ মনে করে নত্যের সন্ধান করে। তাই এই সত্যজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ চারটি আর্যসত্যগুলো হলো যথাক্রমে :

ক . দুঃখ আর্যসত্য
খ. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য
গ. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য
ঘ. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

ক. দুঃখ আর্যসত্য : জীবন মাত্রই দুঃখময়। এতে রোগ আছে, ব্যাধি, জরা, শোক, মৃত্যু আছে। কর্মফলের বন্ধন হেতু সবাইকে জন্ম জন্মান্ড়রে তার নিদারুণ নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বলতে গেলে দুঃখ জন্মে, দুঃখ শৈশবে, দুঃখ বার্ধ্যকে, দুঃখ মরণে। এমনকি দুঃখ প্রিয় বিয়োগে ও অপ্রিয় সংযোগে। এখানে প্রতিনিয়ত মানুষ দুঃখের সাথে সংগ্রাম করে চলছে। সুখ একটি স্বপ্নমাত্র। সুতরাং সংসার জীবনে আবদ্ধ হওয়াই দুঃখের মূল কারণ যা দেহ ও মনের ক্ষণিক্ষতা বিচার করলে বোঝা যায়।

খ. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য : এখানে দুঃখ সমুদয় মানে দুঃখের কারণ বা হেতুকে বোঝায়। দুঃখের মূল কারণ তৃষ্ণা। অগ্নির উপাদান যেমন কাষ্ঠ বা কাঠ তেমনি জন্ম ও জন্ম পরবর্তী দুঃখের উপাদান হলো তৃষ্ণা। কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা, এবং বিভব তৃষ্ণা এ ত্রিধাবিভক্ত তৃষ্ণাই সকল প্রকার দুঃখের মূল কারণ। ইন্দ্রিয় ও বিষয় বাসনার প্রতি আসক্তিই কাম। কাম তৃষ্ণা প্রাণিগণকে সংসার ও জাগতিক ভোগের প্রতি প্রলুব্ধ করে রাখে। ভব তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি অনিত্য সংসারকে আরাম বলে মনে করে। এখানে মিথ্যা ধারণাই ভব উৎপত্তির সহায়ক। জন্ম-মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস না রেখে জীবনকে ভোগ করার ইচ্ছাই হলো বিভব তৃষ্ণা। যাঁরা সকল প্রকার তৃষ্ণা ধ্বংস করতে পারেন, তারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী হন। তাঁরা আর পুর্ণবার জন্ম গ্রহণ করেন না।

গ. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য : দুঃখ এবং দুঃখ সমুদয়ের নিবৃত্তিই হলো দুঃখ নিরোধ। তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা এ দুটি বিষয় প্রাণিকে অবিরত দুঃখ প্রদান করে। তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম-মরণ-শোক-রোদন, মানসিক দুশ্চিন্ড়া সর্বোপরি সব অশান্ড়ির সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণা ধ্বংস হলে একে একে উপাদান, ভব, দুঃখের পরিসমপ্তি হয়। নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়। দুঃখ নিরোধই নির্বাণ। দুঃখ নিরোধই হলো বৌদ্ধদর্শনের মূল লক্ষ্য।

বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ না করলে যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, তেমনি তৃষ্ণার মূলোৎচ্ছেদ না হলে দুঃখ লাভ অবশ্যম্ভাবী। তৃষ্ণা জন্ম-জন্মান্ড়রে দুঃখ বৃদ্ধি ঘটায়। তৃতীয় আর্যসত্য পরিপালন কিংবা অনুশীলনের মাধ্যমে তৃষ্ণাকে ধ্বংস করা যায়।

ঘ. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য : দুঃখ নিরোধের উপায় একটি আচরণ সমন্বিত মার্গ যাকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এর অপর নাম মধ্যমপন্থা। কৃচ্ছতা সাধন এবং ভোগস্পৃহা এই দুটির মধ্যবর্তী অবস্থান হয় বলেই এটি মধ্যপন্থা নামে পরিচিত। আর্য অষ্টাঙ্গিক মর্গে অনুশীলনকারীরাই এই অবস্থানে থাকতে পারে। সুতরাং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস বা প্রত্যয় স্থাপনই হলো চতুর্থ আর্যসত্য।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেরঅঙ্গগুলো হলো যথাক্রমে ;

ক. সম্যক দৃষ্টি, খ, সম্যক সংকল্প, গ. সম্যক বাক্য,
ঘ. সম্যক কর্ম, ঙ. সম্যক জীবিকা, চ. সম্যক ব্যায়ম প্রচেষ্টা,
ছ. সম্যক স্মৃতি এবং জ. সম্যক সমাধি।

উপরি-উলি-খিত মার্গগুলো দুঃখের বিনাশক ও প্রজ্ঞার বিকাশক দুঃখ মুক্তি এবং নির্বাণ লাভের একমাত্র পথ। দুঃখকে প্রকৃষ্টরূপে জেনে তা থেকে মুক্ত হওয়াই মহামতি বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের মূলভিত্তি এবং এই মার্গই বিমুক্তি লাভের উত্তম পন্থা।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর পরিচয়

গৌতম বুদ্ধের অভিনব আবিষ্কার হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তিনি ছিলেন মধ্যপথের অনুসারী। তাঁর শিক্ষা, জীবন-দর্শন সর্বত্রেই যেন এ মধ্যমপন্থার উপস্থিতি রয়েছে। মধ্যপথ হলো কঠোর কৃচ্ছতা এবং অতিমাত্রায় ভোগ-বিলাসের মধ্যস্ড়র। এটা শুধু ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নয়ন ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনই করে না বরং এর সাথে আর্থিক কল্যাণ ও পারস্পরিক সামাজিক সর্ম্পক উন্নয়নের অবদান অতুলনীয়। মধ্যপথ অনুশীলনের দুটি ধারা। একটি হলো আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং অপরটি হলো সুন্দরসমাজ বিনির্মাণ। এটাকে নৈতিক আচরণ মার্গও বলা যায়। নির্বাণ লাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনাচারে আদর্শ সোপান এটি। জীবনের প্রতিটি স্ড়রে কিংবা অধ্যায়ে এ মধ্যপথের গুর"ত্ব রয়েছে। সাধারণ অর্থে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে বিশুদ্ধ আটটি মার্গ বা পথকে বোঝায়। এগুলোর একটি সাথে অপরটির নিবিড় এবং গভীর সর্ম্পক রয়েছে।

বিশুদ্ধ জীবনগঠনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বিশুদ্ধ জীবনচর্চা কিংবা আদর্শজীবন গঠনের অন্যতম পথ হলো অষ্টাঙ্গিকো মার্গ। তাছাড়া এটাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথ বলা হয়। বুদ্ধ এটাকে দুঃখ মুক্তির সোপান হিসেবে অভিহিত করছেন। এটি অনুসরণ করলে ইহ এবং পারলৌকিক জীবন সৎ, সুন্দর ও এবং মনোময় হয় এবং সকল প্রকার দুঃখের অবসান ঘটে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ জীবন সাধনায় 'মধ্যম পন্থা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এখানে দুটি বিষয় বিসর্জনের কথা বলা হয়েছে। এ দুটি বিষয় হলো –

ক. শারীরিক কঠোর কৃচ্ছতা সাধন বর্জন করা।
খ. তীব্র ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করা।

উপরি-উক্ত কোনটিই আদর্শ জীবনগঠনের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। এ জন্য মধ্যম সাধন পদ্ধতিতে এ দুটি বিষয়কে বর্জনের কথা বলা হচ্ছে। যে বা যাঁরা নৈর্বাণিক ধর্ম আচরণ করেন তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ দুটি বিষয়কে পরিত্যাগ করেন। বলা যায়, এগুলো উন্নত এবং বিশুদ্ধ জীবনগঠনের পরিপন্থী।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের স্বরূপ বিশ্লেষণ

এ গুলো হলো যথাক্রমে : ক .সম্যক দৃষ্টি, খ. সম্যক সংকল্প, গ. সম্যক বাক্য, ঘ. সম্যক কর্ম, ঙ. সম্যক আজীব, চ. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, ছ. সম্যক স্মৃতি এবং জ. সম্যক সমাধি।

সম্যক দৃষ্টি : সৎ দৃষ্টি বা যথাযথ দৃষ্টি। এখানে 'সম্যক দৃষ্টি' মানে এমন দৃষ্টিকে বোঝায় যা জগত এবং জীবন সম্বন্ধে একটি সত্য এবং অভ্রান্ত ধারণা দেয়। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, লোভ, দ্বেষ, মোহ, অকুশল কর্ম ইত্যাদি বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা এবং পরিণাম সম্পর্কে সচেতন কিংবা অবহিত হওয়াই সম্যক দৃষ্টি। বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন কিংবা দুঃখমুক্তির ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অপরিহার্য।

সম্যক দৃষ্টিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :

ক. লৌকিক সম্যক দৃষ্টি : এখানে লৌকিক শব্দের অর্থ হলো জাগতিক। সাধারণ জ্ঞান বা জাগতিক জ্ঞানদৃষ্টিকে লৌকিক সম্যক দৃষ্টি বলে।

খ. লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি : লোকোত্তর শব্দের অর্থ হলো পরমার্থিক। মার্গ ও তার ফল সম্পর্ক যুক্ত জ্ঞানই হলো লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি।

আবার শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষভেদে সম্যক দৃষ্টি তিন প্রকার। যেমন :

ক. লৌকিক সম্যক দৃষ্টি : কর্ম ও কর্মফলের বিশ্বাসই লৌকিক সম্যক দৃষ্টি।

খ. শৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি : স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি ও অনাগামি এ তিন মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনই হলো শৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি।

গ. অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি : অরহতগণের জ্ঞানকে অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি বলে।

সম্যক সংকল্প : প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য যে দৃঢ় প্রত্যয় বা প্রতিজ্ঞা সেটা হলো 'সম্যক সংকল্প'। এখনে সম্যক সংকল্প বলতে বিষয়ের প্রতি আসক্তি ও হিংসা-দ্বেষ পরিহার এবং ঐহিক সঙ্গতির পথ ত্যাগ করা বোঝায়। সম্যক সংকল্প বলতে আমরা বুঝি উত্তম সংকল্প। বিদ্যা অর্জনে, ধন সম্পদ অর্জনে, নানাবিধ সাধনায় এবং পরম মুক্তির জন্য সম্যক সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। এ রকম সংকল্পের ফলে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সফল হওয়া যায়। এ সম্যক সংকল্প তিন প্রকার। যথা :

ক. নৈষ্ক্রম্য সংকল্প : ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের মাধ্যমে যে সংকল্প তাকে বলা হয় নৈষ্ক্রম্য সংকল্প।

খ. অব্যাপাদ সংকল্প : মন বা চিত্তের অকুশলভাব ত্যাগ করে কুশল চিন্তায় মনোনিবেশ করার নামই হলো অব্যাপাদ সংকল্প।

গ. অবিহিংসা সংকল্প : হিংসা বৈরিতাভাব ত্যাগ করে সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রী এবং করুণা প্রর্দশন করাই হলো অবিহিংসা সংকল্প।

সম্যক বাক্য : অর্থাৎ সৎ বা সুভাষিত বাক্য। যেখানে কোনো রকম মিথ্যা আশ্রয় থাকে না। 'সম্যক বাক্যে'-এর অর্থ হলো বাক্যে সংযম কিংবা সৎ বাক্যের অনুশীলন। অর্থাৎ সত্যভাষণ অন্যের আচরণে যা প্রশংসাযোগ্য তার প্রশংসা করা, ভদ্রপ্রীতিপূর্ণ ভাষণ এবং আলাপ-আলোচনায় নিজের বাক্য সীমাবদ্ধ রাখা। মিথ্যা, কর্কশ, সম্প্রলাপ, বৃথাবাক্য ভাষণ পরিত্যাগ করা। কারো বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা এবং বিরূদ্ধাচরণ উচ্চারণ না করা। সম্যক বাক্যের ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেই সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্যক কর্ম : তার অর্থ হলো সুন্দর এবং নান্দনিক কর্ম সম্পাদন করা। অহিংস চিত্তে সাধুজনোচিত কর্ম সম্পাদনই সম্যক কর্ম । অন্যভাবে বলা যায়, যে কর্মে কোনরকম পাপের ছোঁয়া বা স্পর্শ থাকে না তাকে সম্যক কর্ম বলা হয়। মিথ্যাভাষণ, চুরি, ডাকাতি, মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন, সামাজিক ব্যভিচার সম্যক কর্ম অনুসারে গর্হিত অপরাধ। এ রকম পাপময় বিষয়কে পরিহার করে নির্দোষ এবং নিষ্কুলষ জীবন ও কর্ম পরিচালনা করাই হলো সম্যক কর্ম। তিনটি দ্বার দিয়েই এ কর্ম সংঘঠিত হয়। যথা ১. কায় দ্বার বা কায়িক ২. বাক্য দ্বার বা বাচনিক, এবং ৩. মনো দ্বার বা মানসিক। আমাদের সম্পাদিত সকল কর্মই এ তিন দ্বারের যে কোন একটি দ্বারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

সম্যক আজীব বা জীবিকা : 'সম্যক আজীব বা জীবিকা' বলতে আমরা বুঝি সৎ বা পবিত্র জীবিকা। এটাকে আবার নির্দোষ জীবিকাও বলা যায়। এখানে সম্যক জীবিকা বলতে এমন জীবিকাকে বোঝানো হয়েছে যাতে বুদ্ধের অনুজ্ঞা লঙ্ঘিত না হয়। বুদ্ধ নির্দেশিত এবং প্রদর্শিত পঞ্চনীতিতে যেগুলো বর্জন করার উপদেশ রয়েছে সেগুলো বর্জন করে জীবিকা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়। সুন্দর এবং মনোময় জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মে পাঁচ প্রকার বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে–ক. মৎস ব্যবসা খ. মাংস ব্যবসা গ. অস্ত্র ব্যবসা ঘ. বিষ ব্যবসা এবং ঙ মাদকজাতীয় দ্রব্য ব্যবসা।

চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, প্রতারক, শঠক, প্রবঞ্চক, উৎকোচ গ্রহণকারীকে সবাই ঘৃণা করে। কারণ এগুলো সুন্দর এবং আদর্শ জীবিকা নয়। সৎ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবসময় সম্যক জীবিকার মাধমে জীবনযাপনে উৎসাহবোধ করেন। এ রকম জীবিকা নির্বাহ করাই বৌদ্ধধর্মে প্রশংসিত।

সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা : মন হতে সকলপ্রকার খারাপ চিন্তা-চেতনা প্রকৃষ্টরূপে বিদূরিত করার সচেতনাই হলো 'সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা' । এটার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মনে কুচিন্তা-চেতনা প্রবেশ করতে না দেওয়া। সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা চার প্রকার। সেগুলো হলো :

ক. অনুৎপন্ন অকুশল বিষয় মনে উৎপন্ন হতে না দেওয়া।

খ. উৎপন্ন অকুশল চিন্তা মন থেকে পরিহার করা ।

গ. অনুৎপন্ন কুশল চিন্তা মনে উৎপন্ন করা।

ঘ. উৎপন্ন কুশল চিন্তা সর্বদা সংরক্ষণ করা।

মানুষ সম্যক প্রচেষ্ট ছাড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কখনো পৌছাতে পারে না। সম্যক প্রচেষ্টা অনুযায়ী সবাই কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারে। বিদ্যা, ধন, জ্ঞান এবং ধ্যানের জন্য সম্যক প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রচেষ্টার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্যক স্মৃতি : স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ বা ধারণ করা। দৈহিক এবং মানসিক সকল প্রকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ করে স্মরণ রাখাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় স্মৃতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কুশল অবলম্বন পুনঃপুন স্মরণ করার নামই স্মৃতি। দেহ অনিত্য, আত্মীয়-স্বজন অনিত্য, বন্ধু-বান্ধব অনিত্য, জাগতিক বিষয়বস্তু অনিত্য, ধন সম্পদ অনিত্য। বলা যায়, নিজের অস্তিত্ব এবং বিশ্বপ্রবাহ অনিত্য। এগুলোর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই তা মনে রাখাই হলো 'সম্যক স্মৃতি'।
সম্যক স্মৃতি চার প্রকার। যথা

১. কায়ানুদর্শন : শরীরের ভিতরে এবং বাইরে দর্শন করাই হলো কায়ানুদর্শন।
২. বেদনানুদর্শন : দেহের সুখ এবং দুঃখানুভূতি অনুভব করাই হলো বেদনানুদর্শন।
৩. চিত্তানুদর্শন : মন বা চিত্তের সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াই হলো চিত্তানুদর্শন।
৪. ধর্মানদর্শন : সেবনীয় ধর্ম, অসেবনীয় ধর্ম, বর্জনীয়, অবর্জনীয়, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সর্ম্পকে দর্শনই হলো ধর্মানুদর্শন।

সম্যক সমাধি : চিত্তের একাগ্রতাই হলো সম্যক সমাধি। ব্যাপক অর্থে সর্বদা, সকল বিষয়ে চিত্তের সচেতন একাগ্রতাই 'সম্যক সমাধি'। অর্থাৎ একটি বিশেষ বিষয়ের উপর মনকে নিবিষ্ট করা। অর্থাৎ তীব্র কামনা-বাসনা, লোভ-দ্বেষ-মোহ, হিংসা প্রভৃতি মনোভাব হতে মুক্ত হয়ে একটি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্নীত হওয়া এবং ঐ অবস্থায় নিজের আপনচিত্তকে সংযত করার মহান সাধন প্রক্রিয়াই হলো সম্যক সমাধি। মিলিন্দ প্রশ্ন নামক গ্রন্থে সমাধির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ; 'সকল কুশল কর্মই সমাধি মুখ, সমাধি নিম্ন'। অর্থাৎ রণক্ষেত্রে যেমন হাতী, ঘোড়া, রথ, পদাতিক বাহিনী প্রভৃতি যুদ্ধের সাজ-সজ্জা রাজাকে অনুসরণ করে, রাজাকে রক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকে ঠিক তেমনি সমাধিও। সমাধিস্থ ব্যক্তিই একমাত্র যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অঙ্গসমূহকে প্রজ্ঞা, শীল এবং সমাধি ভেদে তিনভাগে বিভাজন করে দেখানো হয়েছে।

ক. প্রজ্ঞা - সম্যক দৃষ্টি
সম্যক সংকল্প
খ. শীল - সম্যক বাক্য
সম্যক কর্ম
সম্যক জীবিকা
গ. সমাধি- সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা
সম্যক স্মৃতি
সম্যক সমাধি

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো একটি প্রস্তুতির পথ। প্রত্যক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহিরে থেকেও শুধু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যে কোন মানুষ পুত-পবিত্র, শান্তিময় জীবনযাপন করতে পারে তার একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি কিংবা নির্দেশনা এখানে রয়েছে। এগুলো নাগরিক জীবনে অনুশীলিত হলে স্থিতিশীল পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৮.১

এক কথায় উত্তর দিন

১. আর্যসত্যের শব্দগত অর্থ কী?
২. চারি আর্যসত্য কী কী?
৩. মানুষ কিসে আচ্ছন্ন?
৪. প্রকৃত সুখের অধিকারী কারা?
৫. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
৬. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কয়টি অঙ্গ?
৭. সম্যক দৃষ্টি কয়ভাগে বিভাজিত?
৮. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা কয় প্রকার?
৯. সম্যক স্মৃতি কয় প্রকার?

১০. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. আর্যসত্য বলতে কী বুঝায়?
২. দুঃখ আর্যসত্য কী?
৩. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য কী?
৪. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য কী?
৫. চারি আর্যসত্যকে বৌদ্ধদর্শনে কী বলা হয়?
৬ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কাকে বলে?
৭ সম্যক জীবিকা বলতে কী বোঝেন?
৮. সম্যক প্রচেষ্টা বলতে কী বোঝেন?
৯. সম্যক স্মৃতি বলতে কী বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চারি আর্যসত্য বলতে কী বোঝ? চারি আর্যসত্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লিখুন।
২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে কী বুঝ? সমাজজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা-লিখুন।
৩. সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি সম্পর্কে আপনি যা জানেন আলোচনা করুন।

পাঠ-২ বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা : শীল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- চরিত্রবান ব্যক্তির জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শীলপালনের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- শীলপালন নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- পঞ্চশীল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- অষ্টশীল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- দশশীল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- শীলপালনের সুফল সর্ম্পকে বলতে পারবেন।

শীলের পরিচয়

বুদ্ধের শিক্ষায় ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনকে সুন্দর, নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের নৈতিক উৎকর্ষ ছাড়া জীবনে সফলতা কখনো আসে না । নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে প্রজ্ঞা (wisdom) এবং সমাধি (Concentration of mind) লাভ হয় না। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে নৈতিক শিক্ষার উপদেশ রয়েছে এবং সেগুলো মানুষের নীতিবোধকে জাগ্রত করে ও উন্নত সমাজগঠনের পরিকল্পিত চিন্তা-চেতনায় অনুপ্রাণিত করে। বিনয় পিটকে এ সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা রয়েছে। মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে, দমগুণ অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানবসত্তার বিকাশ ঘটানো অন্যতম লক্ষ্য। এখানে অসদাচরণজনিত বিক্ষিপ্ত, দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক অপক্রিয়ার পরিত্যাগের নির্দেশনাও রয়েছে।

শীলপালনের গুরুত্ব

শীল অর্থাৎ নিয়ম-নীতি, নৈতিকতা, শৃঙ্খলাবোধকে 'শীল' বলে। ইংরেজীতে যাকে morality বলা হয়। 'শীল' হলো কতকগুলো নিয়ম-নীতির সমষ্টি। সদাচার এবং সৎ চরিত্রও শীলার্থে ব্যবহৃত হয়। শীলের প্রধান লক্ষণ হলো মহত্ত্বতার দ্বারা হীনতার অপসারণ করা। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ ত্রিপিটকে উলে- খ আছে, 'বিনয নাম বুদ্ধ আয়ু। বিনয ঠিতে সাসনং ঠিতো হোতি'। অর্থাৎ শীল বা বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু স্বরূপ। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধ শাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। মহামতি গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কিছুদিন পরেই বিনয় (শীল) সম্পর্কিত বিষয় অনুধাবন করে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির মাধ্যমে বিনয় এবং ধর্ম সংরক্ষণের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। এটিই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থনার মূলভিত্তি।

জগতের সবই নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রকৃতিরও নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নীতি রয়েছে। নিয়ম কিংবা নীতি বিরুদ্ধ হয়ে উচ্ছৃঙ্খলভাবে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারে না। গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতুচক্র নিয়মে আবর্তিত হয়। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য, আকাশের সূর্যরশ্মি, রংধনুর বর্ণের সমারোহ, অঙ্কুরিত তৃণখন্ড পর্যন্ত একটি কার্যকারণ নীতিতে আবদ্ধ। নিয়ম বর্হিভূত কোনো কিছুরই বৃদ্ধি ও বিনাশ কিংবা স্থায়িত্ব আশা করা যায় না। কেননা প্রত্যেকটি বিষয়ই কার্য-কারণ নিয়মে আবদ্ধ। মানুষের সার্বিক উন্নতি কিংবা কল্যাণে এ নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এটি উপলব্ধি করা যায়। অসংযমতা, অনৈতিকতা, অমিতব্যয়িতা, আলস্য পরায়ণতা, উদ্যমহীনতা, উৎসাহীনতা প্রভৃতি উন্নতির পরিপন্থী। অপর দিকে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, নৈতিকতা, স্থিরতা, ধীরতা , আত্মত্যাগ, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্যম এবং উৎসাহ ইত্যাদি জীবনে উন্নতির সহায়ক শক্তি। বিনয় বা শীল চলার পথের পাথেয় ও মানবজীবনের মুকুট স্বরূপ। বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় এ সত্যকে প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করেছেন।

শীলপালনের উদ্দেশ্য

চারিত্রিক কল্যাণ সাধন প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। চরিত্রবান ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে যশ, খ্যাতি, প্রশংসা লাভ করে। সুন্দর এবং পবিত্র জীবনযাপন করাই হচ্ছে শীলপালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শীলপালনের মাধ্যমে সচরাচর চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়। যথা :

১. মানুষের কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক সংযমতা আসে।
২. মনের লোভ, দ্বেষ, মোহ, সন্দেহ বিদূরিত হয়ে মন শান্ড় ও প্রফুল- থাকে।
৩. সবধরণের অশুভ চিন্ড়া দূর হয়।
৪. ক্রোধ কিংবা হিংসাভাব দূর হয়।

৫. মানবিক কল্যাণবোধ জাগ্রত হয়।
৬. সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।
৭. আদর্শবান ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া যায়।
৮. আধ্যাত্মিক এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করে।

শীলপালনের নিয়ম বা পদ্ধতি

প্রতিটি বিষয় পালনের কতকগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি আছে যা শীলপালনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে শীল পালনকারীদের নিম্নোক্ত নিয়মগুলো মেনে চলতে হয়। যেমন :

১. উচ্চারিত প্রতিটি শীল উৎসাহ সহকারে পালন করতে হয়।
২. আচরণের ক্ষেত্রে সংযমতা প্রর্দশন করতে হয়।
৩. পবিত্র মনের অধিকারী হতে হয়।
৪. ধর্মের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা রাখতে হয়।
৫. সর্বদা ভালো চিন্তা করতে হয়।
৬. মৈত্রী পরায়ণ হতে হয়।
৭. লোভ-দ্বেষ-মোহের বশীভূত না হওয়ার চেষ্টা করতে হয়।
৮. অন্যের ক্ষতি হয় এমন কাজ না করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়।

উপরি-উলি-খিত শীলপালনের নিয়মগুলো পালন করা সকলেরই কর্তব্য। এগুলো পরিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ শীলপালন সহায়তা করে। সম্যকভাবে শীলপালন করতে না পারলে কখনো শীলের সুফল লাভ হয় না।

শীল আচরণের মূল উপাদান হলো পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীল বা গৃহীশীল, অষ্টশীল বা অষ্টনীতি বা উপোসথ শীল, দশশীল বা দশনীতি, আজীবটাঠম্ক শীল বা সদাচরণ নীতি এবং চতুপরিশুদ্ধ শীল বা পবিত্রতার নীতি শীল।

১. পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতিগুলো হলো :
ক. প্রাণি হত্যা হতে বিরত থাকা।
খ. অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
গ. অবৈধ যৌন সম্পর্ক হতে বিরত থাকা।
ঘ. মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা।
ঙ. সকল প্রকার মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

২. অষ্টশীল বা অষ্টনীতিগুলো হলো :
ক. প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকা।
খ. অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
গ. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকা।
ঘ. মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা।
ঙ. সকল প্রকার মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
চ. বৈকালিক ভোজন থেকে বিরত থাকা।
ছ. মাল্যগন্ধপুষ্প-এর ব্যবহার এবং দেহ সৌন্দর্য বিধানের জন্য সুগন্ধি তৈল বা চূর্ণ বা প্রসাধনাদির অনুলেপন থেকে বিরত থাকা।
জ. উচ্চ এবং আরাম শয্যায় উপবেশন বা শয়ন থেকে বিরত থাকা।

৩. দশশীল বা দশ নীতিগুলো হলো :
ক. প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকা।
খ. অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
গ. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকা।
ঘ. মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা।
ঙ. সকল প্রকার মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা।
চ. বৈকালিক ভোজন থেকে বিরত থাকা।
ছ. নৃত্যগীতি বাদ্য শ্রবণ-দর্শন এবং ব্যবস্থপনা থেকে বিরত থাকা।

জ. মাল্যগন্ধপুষ্প-এর ব্যবহার এবং দেহ সৌন্দর্য বিধানের জন্য সুগন্ধি তৈল বা চূর্ণ বা প্রসাধনাদির অনুলেপন থেকে বিরত থাকা।

ঝ. উচ্চ আরামপ্রদ শয্যায় উবেশন বা শয়ন থেকে বিরত থাকা

ঞ. স্বর্ণ এবং রৌপ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

শীলপালনে সুফল

শীলপালনের সুফল সর্ম্পকে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের সময় তদানীন্ড়ন ভারতবর্ষের পাটলীগ্রামে উপস্থিত হয়ে পাঁচটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. শীলবান ব্যক্তি উৎসাহ সহকারে শীলপালনে রত থেকে প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেন।
২. শীলপালনের দ্বারা শীলবান ব্যক্তির সুকীর্তি বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়।
৩. শীলবান ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং শ্রামণের পরিষদে নির্ভয়ে উপস্থিত হন।
৪. শীলবান ব্যক্তি শীলপালনের দ্বারা সজ্ঞানে মৃত্যু হয়।
৫. শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

এছাড়া এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন ; শীলপালনের মাধ্যমে ভোগসম্পত্তি লাভ এবং নির্বাণ লাভ কর যায়।

বৌদ্ধধর্মে শীলকে রক্ষাকবচ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই শীল পরিপালনের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন করা যায়, পবিত্রতার সাথে জীবনযাপন করা যায়, সর্বোপরি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায়। উপরি-উক্ত শীলগুলোর মধ্যে পঞ্চশীল অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। একে গৃহীশীলও বলা যায়। প্রত্যেক বৌদ্ধ মাত্রই পঞ্চশীল পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। পঞ্চশীলের অন্ড়র্নিহিত অর্থে দেখা যায়, এগুলো শুধু বৌদ্ধদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির নৈতিকজীবন গঠনেও বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। পঞ্চশীল পরিপূর্ণ আদর্শ জীবনশৈলী এবং সর্বজন কল্যাণপ্রদ আচার-সংস্থান। শীল বা নীতিগুলো পালনের দ্বারা মানুষ সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়। পরিবারে, সমাজে এবং দেশে সুখ-শান্ড়ি সমৃদ্ধি সুরক্ষিত হয়। অন্যান্য শীলগুলো বা নীতিগুলো সন্ন্যাসধর্ম সম্পর্কিত। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুনীদের ক্ষেত্রে এই শীল বিচ্যুতি 'বিনয়' বিরোধী বলে বিবেচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.২

এক কথায় উত্তর দিন

১. শীল-এর আভিধানিক অর্থ কী?
২. বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি কী?
৩. শীলবান কারা?
৪. পঞ্চশীল কী?
৫. অষ্টশীল কী?
৬. মানুষের পরম সম্পদ কী?
৭. শীলপালনের উদ্দেশ্য কী?
৮. পঞ্চশীলের অপর নাম কী?
৯. অষ্টশীলের অপর নাম কী?
১০. চারিত্রিক গুণাবলী কিসের দ্বারা অর্জিত হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শীলপালনের নিয়মাবলী বর্ণনা করুন।
২. পঞ্চশীলগুলো লিখুন।
৩. অষ্টশীলগুলো লিখুন।
৪. দশশীল কারা পালন করেন লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শীল কী? শীলপালনের সুফল সর্ম্পকে বিস্ড়রিত আলোচনা করুন।
২. শীলপালনের গুরুত্ব নিজের ভাষায় তুলে ধরুন।
৩. শীল সর্ম্পকে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠ-৩: দান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- দান কী বুঝতে পারবেন।
- দান কী করে দিতে হয় জানতে পারবেন।
- দানীয় সামগ্রী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রকৃত দাতা কারা বলতে পারবেন।
- দানের গুর"ত্ব বলতে পারবেন।
- দানের গুণাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দানের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

দানের পরিচয়

'দান' অতি পরিচিত অর্থবোধক শব্দের নাম। 'দান' বলতে সচরাচর আমরা আমার যা দেওয়া হয় তাকেই বুঝি। তবে কোন কিছু দিলেই তা দানের পর্যায়ে পড়ে না। দান হতে হবে সম্প্রদানে, যেখানে স্বত্ব এবং স্বার্থ কোনটিই থাকতে পারবে না। তা ছাড়া সৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দান দিতে হয়। সুতরাং অন্তরে কুশলকর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে অন"ড়রে দান চেতনা উৎপন্ন করে স্বত্ব ও স্বার্থ ত্যাগ করে উপযুক্ত পাত্রে দান দেওয়াই হচ্ছে দান। সকল প্রকার পারমীর মধ্যে দান পারমীই প্রথম সোপান।

দান

আগেই বলেছি 'দান' বলতে স্বাভাবিকভাবে আমরা অন্যকে কোন কিছু দেওয়াকে বুঝি। তবে এক্ষেত্রে কাউকে কিছু দিলেই এটি দানের পর্যায়ে পড়বে এমনটি ভাবা উচিত নয়। দান করার আগে দরকার মনের পবিত্রকরণ এবং সৎ চেতনাবোধ। তাছাড়া দান করতে গেলে স্বত্ব এবং স্বার্থ দুটিই সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। দানের মধ্যে স্বত্ব এবং স্বার্থ থাকলে সেই দান কোন প্রকার সুফল বয়ে আনতে পারে না। উপযুক্ত পাত্রে দান দেওয়াই উত্তম দান।

দান সামগ্রী

বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থে দশটি উত্তম দানীয় সামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য -

অন্ন পানং বত্থং যানং
মালাগন্ধ বিলেপনং
সেয্যা বসথ পদীপেয্যং
দান সবত্থু ইমে দসা।

অর্থাৎ - অন্ন বা খাদ্য, জল বা পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মালা (ফুল বা জপমালা), সুগন্ধদ্রব্য (ধূপাদি), বিলেপন (দেহ পরিস্কার রাখার সামগ্রী), শয্যা (শয়ন যোগ্য), গৃহ (বাসযোগ্য), প্রদীপ ইত্যাদি।

দানের গুরুত্ব

যে সমস্ড় মহৎ কাজ রয়েছে তন্মধ্যে দান উত্তম কাজ। দানের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রফুল- তা আসে আর চিত্তের বিশুদ্ধি আনয়ন করে। দানচিত্ত অধিকারী সম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকে সবধরণের অকুশলকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হন। দান সবাইকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে সহায়তা করে। সকল প্রকার অবহেলিত যেমন দীন-দুঃখী, অসহায়, পুঙ্গ, অন্ধ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল অনুপ্রেরণায় উদ্ধুদ্ধকরণে সহায়তা করে। এ রকম অকৃত্রিম দান চেতনার ফলে মানুষে মানুষে সদ্ভাব, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সর্বোপরি সৌভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ়বন্ধন গড়ে উঠে।

বৌদ্ধধর্মে দানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বৌদ্ধধর্মে চারপ্রকার নরকের নাম উল্লেখ রয়েছে। মন্দ কাজ করার ফলে সবাই মৃত্যুর পর এ সমস্ড় নরকে জন্মগ্রহণ করে। এখানে জন্মের পর সবাই নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। সৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তম দান দিয়ে সেই নরকবাসীদেরকে সেই নরকযন্ত্রণা কিংবা সীমাহীন দুঃখ থেকে মুক্ত করা যায়।

[

যাদের দান চেতনা নেই তাদেরকে সবাই কৃপণ বলে জানে। কৃপণ লোক সমাজে তেমন সমাদৃত হয় না। অন্যদিকে দান দেওয়ার ফলে দানশীল ব্যক্তি সমাজে কিংবা সকলের প্রিয়ভাজন বা শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং দানের প্রতি সবার সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রকৃত দাতা

কাউকে কিছু দিলে কিন্তু তা দানের পর্যায়ে পড়ে না। অনুরূপভাবে যিনি দান দেন তিনিও দাতা বলে বিবেচিত হন না। সুতরাং সঙ্গতকারণে প্রশ্ন জাগে প্রকৃত দাতা কে? এখানে বলা বাহুল্য যে, তিনটি বিষয়ে যিনি সচেতন থাকেন তিনিই প্রকৃত দাতা বলে স্বীকৃত। এ তিনটি বিষয় হলো : ক. বস্তুসম্পত্তি, খ. চিত্ত সম্পত্তি এবং গ. প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

ক. বস্তুসম্পত্তি : দান দেওয়ার বস্তু সর্ম্পকে সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার নামই হলো বস্তু সম্পত্তি। অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থের দান কোনভাবেই ফলপ্রসূ হয় না। সদুপায় এবং পরিশ্রমে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত বস্তু দানই হলো উত্তমদান।

খ. চিত্তসম্পত্তি : দান দেওয়ার সময় নিজ অন্ড়রে কুশলচেতনা বা কুশল ভাব উৎপাদনকেই বলা হয় চিত্তসম্পত্তি। দান চেতনা উৎপন্ন না করে দান দিলে তা কোন অবস্থাতেই সুফল বয়ে আনতে পারে না। এজন্য উক্ত হয়েছে : দানের পূর্বে, দানের সময় সর্বোপরি দানের পরেও অন্ড়রে কুশল চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে। এরকম দানের ফল অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক।

গ. প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি : যাকে দান দেওয়া হয় সেই দানগ্রহীতা শীলবান কিনা তা যথাযথ বিচার-বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত পাত্রে দান করাই হচ্ছে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

দাতার গুণাবলী

দান দিলেই যে কেউ উত্তম দাতা হতে পারে না। উত্তম দাতা হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু গুণাবলী থাকা অত্যাবশ্যকীয়। এ গুলো হলো নিম্নরূপ :

১. দান ও দানফল প্রাপ্তিতে প্রগাঢ় থাকা।
২. দানীয় বস্তু এবং গ্রহীতা কাউকে অবহেলা করা যাবে না।
৩. নিজ হস্ড়ে দান দেওয়া বাঞ্চনীয়।
৪. অসময়ে দান না করে যথাসময়ে উপযুক্ত গ্রহীতাকে দান দিতে হবে।
৫. দান দেওয়ার সময় কৃপণতা ত্যাগ করতে হবে।
৬. দান দেওয়ার সময় চিত্তের প্রসন্নতা থাকতে হবে।
৭. দান দেওরার সময় নিজেকে উত্তম দাতা বিবেচনা করা যাবে না।
৮. দান দেওয়ারর সময় দান গ্রহীতাকে অধম এমন কল্পনা করা যাবে না।

দাতার প্রকারভেদ

বৌদ্ধধর্ম মতে, প্রকৃত দাতা হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মানুষ না কিছু দান করে। এ দান দেওয়ার চরিত্রকে বিচার করে দাতাকে তিন শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন : ক. দানদাস, খ. দানসহায় এবং গ. দানপতি।

ক. দানদাস : যে দাতা নিজে যেরূপ খাবার গ্রহণ করে সেরূপ খাবার দান না দিয়ে তার চেয়ে আরো নিম্নমানের খাবার পরিবেশন কিংবা দান করেন তিনিই দানদাস হিসেবে বিবেচিত।

খ. দানসহায় : যে দাতা নিজে যে রকম খাবার গ্রহণ করে অন্যদেরকে একই রকম খাদ্যভোজ্য এবং পানীয় দ্বারা পরিবেশন কিংবা দান করেন তাঁকে বলা হয় দানসহায়।

গ. দানপতি : যিনি নিজে যে রকমের খাবার গ্রহণ করেন অথচ দান দেওয়ার সময় তার চেয়ে আরো উন্নত এবং উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন কিংবা দান দিয়ে থাকেন তিনিই দানপতি বলে পরিচিতি লাভ করে।

বৌদ্ধধর্মে দানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দান করার পূর্বে মনের পবিত্রতা সাধন দরকার। আমরা ত্যাগ করতে পারি না বলেই আমাদের দুঃখের অন্ড় নেই। এজন্য দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রত্যেককে যৎসামান্য হলেও ত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। প্রতিদিন সামান্য সামান্য ত্যাগের মাধ্যমে মহান কিছু ত্যাগের চেতনা অন্তরে জাগ্রত হয়। মহাদানের চেতনা বস্তুদান থেকেই শুরু করা বাঞ্চনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.৩

এক কথায় উত্তর দিন

১. দান-এর অর্থ কী?
২. দান করার সময় কী ত্যাগ করতে হয়?
৩. দানীয় সামগ্রীসমূহ কী কী?
৪. দান করার মধ্য দিয়ে মানুষ কিসের অধিকারী হয়?
৫. প্রকৃত দাতা কারা?
৬. দাতাকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?
৭. উত্তম দান কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দান কাকে বলে?
২. দানীয় সামগ্রীসমূহ কী কী লিখুন?
৩. প্রকৃত দাতা বলতে কী বোঝেন?
৪. চিত্তসম্পত্তি কাকে বলে?
৫. বস্তুসম্পত্তি কাকে বলে?
৬. দানদাস কাকে বলে?
৭. দানসহায় কাকে বলে?
৮. দানপতি কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. দান বলতে কী বোঝেন? দানের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।
২. প্রকৃত দাতার সংজ্ঞা প্রদান করে দানের প্রকাভেদ সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

পাঠ-৪ : ব্রহ্মবিহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি

- ব্রহ্মবিহার কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ব্রহ্মবিহারের শব্দগত অর্থ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মৈত্রীর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- করুণার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মুদিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- উপেক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পারিবারিক জীবনে ব্রহ্মবিহারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- ব্রহ্মবিহারের ফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ব্রহ্মবিহারের পরিচয়

লোভ, দ্বেষ, মোহ, সন্দেহ, ঈর্ষা প্রভৃতি ঘৃণ্যতম চিত্তবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে বুদ্ধ চারটি মহৎ গুণাবলী উল্লেখ করছেন। এগুলো চারটি ধারায় প্রতফলিত হয়। যথা : ক. মৈত্রী, খ. করুণা গ. মুদিতা, এবং ঘ. উপেক্ষা। সমন্বিতভাবে এগুলোকে ব্রহ্মবিহার বলে অভিহিত করা হয়। ব্রহ্ম বা নৈতিকতা অর্থে উৎকৃষ্ট অবস্থা-এ অবস্থান করাই হলো 'ব্রহ্মবিহার'।

ব্রহ্মবিহারের শাব্দিক অর্থ

'ব্রহ্মবিহার'-এর অর্থ উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্মবিহার' বলতে সাক্ষিকরূপে বসবাস করাকে বোঝায় । অন্যভাবে বলা যায়, গুণগত আচার-আচারণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে মুখে বসবাস করা এবং সর্বজীবের প্রতি অপ্রমেয় আন্তরিক সুখানুভূতি জাগ্রত করা।

ব্রহ্মবিহারের স্বরূপ ও প্রকৃতি

ক. মৈত্রী : মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দ হলো শুভেচ্ছা, হিতাকাঙ্ক্ষা, সৌহার্দ্য, পরোপকারিতা, হিতচিন্ড়া ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ প্রতিশব্দ হলো অশুভ চিন্ড়া-চেতনা এবং ক্রোধ। অন্যভাবে বলা যায়, মৈত্রী হলো মিত্রতা বন্ধুত্ব যেখানে প্রেম বা ভালবাসার স্পর্শ থাকে, নির্মল প্রেম থাকে। এ মৈত্রীর মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে জয় করা যায়। এখানে সর্বপ্রাণীর প্রতি মমতায় চিত্ত জাগ্রত রাখাই হলো মৈত্রী। মৈত্রীর অনুসারী হলে লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, সর্বোপরি অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। সকল প্রকার প্রাণীকে নিজের মতো দেখতে হবে। এখানে সুত্তনিপাতর অর্ন্তগত মেত্তাসুত্ত বা মৈত্রী সূত্রে মৈত্রীভাবের প্রায়োগিক ব্যবহার সর্ম্পকে উলি- খিত হয়েছে :

মাতা যথা নিযং পুত্তং, আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

অর্থাৎ মাতা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণির প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবেন। এখানে মাতার সন্তানের প্রতি আচরণের সাথে ভাবনা প্রণোদিত মানুষের আচরণের তুলনা করেছেন। মায়ের নিজের কোন স্বার্থ নেই। সন্তানের মঙ্গলও কল্যাণ কামনায় তিনি নিবেদিত প্রাণ। এখানে সন্তানের সুখেই তাঁর সুখ। এরূপ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদানের কথা এখানে উলি- খিত হয়েছে।

নিঃস্বার্থ পরোপকারই হলো মৈত্রীর লক্ষণ। মিত্রতা (দয়ালু মনোভাব) হলো মৈত্রীর স্বভাব। মৈত্রী সবাইকে স্বার্থহীন, ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল হবার শিক্ষা দেয়। মনকে সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে রাখতে সহায়তা করে। যে বা যারা মৈত্রীর অনুশীলন করে তারা এগার প্রকার আনিশংস বা ফল লাভ করে।

১. সুখে নিদ্রা যায়, ২. সুখে জাগ্রত হয়, ৩. কোনোরূপ পাপময় স্বপ্ন দেখে না, ৪. মানুষের সুপ্রিয় হয়, ৫. অমনুষ্যদেরও প্রিয় হয়, ৬. দেবতারা সবসময় তাকে রক্ষা করে, ৭. শরীরে অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারে না, ৮. চিত্ত সমাধিস্থ হয়, ৯. মুখবর্ণ প্রসন্ন হয়, ১০. সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করে, ১১. মৃত্যুর পর উর্দ্ধলোক লাভ করে।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি সীমাহীন ভালাবাসাই হলো মৈত্রী যা দেশ-কাল বা জাতি'র বাধা অতিক্রম করে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করে। এটা কোনো আসক্তিময় ভালোবাসা বা প্রেম নয়। এ হলো সর্বজীবের প্রতি অপরিসীম দ্বিধাহীন ভালোবাসা। একথা বলা যেমন সহজ কর্মে বাস্তবায়ন খুবই দুঃসাধ্য। সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে সবার মঙ্গল কামনা করাই হলো মৈত্রী। ধর্মপদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ; হিংসার দ্বারা হিংসা ধ্বংস হয় না। একমাত্র মৈত্রীর দ্বারাই বিদ্বেষ-এর অবসান হয়।

খ. করুণা : ব্রহ্মবিহারে চিত্তমুক্তির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে করুণাকে দেখানা হয়েছে। অন্যের দুঃখ দেখে মনে দুঃখ উৎপন্ন হয় এবং তা দূর করার অভিপ্রায় জাগে তার নাম করুণা। অন্যভাবে বলা যায়, পীড়িত সন্ড়ানের প্রতি মাতার যেরূপ স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতা সেরূপ পৃথিবীর সমস্ড় প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা ও সহানুভূতিবশত চিরশ্বাশত অনুকম্পা প্রর্দশন করাই হলো করুণা। করুণার প্রত্যক্ষ শত্রু হলো নীতি বিবর্জিত হিংসা এবং পরোক্ষ শত্রু হলো দুর্মনতা বা পরশ্রীকাতরতা। কর"ণার বৈশিষ্ট্য হলো অপরের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণ করার ঐকান্তিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখান বা প্রত্যাহার করা হলো করুণার স্বভাব। দুঃখ বিমোচন বা অপসারণ করার ইচ্ছা-ই করুণার মূল লক্ষণ। করুণার দুটি দিক। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্ড়রিকবোধ এবং অন্যটি হলো দুর্গতের দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এখানে একটি চেতনাভিত্তিক এবং অপরটি কর্মভিত্তিক।

গ. মুদিতা : এটি হলো তৃতীয় মহৎ মানবিক গুণ। অপরের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিতে সুখ-প্রশংসায় আনন্দ, যশ-ঐশ্বর্যে মনে প্রীতিবোধ উৎপন্ন করার নামই হলো মুদিতা। এখানে মুদিতার শিক্ষা হলো সবাই যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করে। কেউ যেন অসুখী না হয়।

পরের সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদনই হলো মুদিতার লক্ষণ। মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, এটাকে প্রশংসাসূচক আনন্দও বলা হয়। ঈর্ষাভাব ধ্বংস হলেই মুদিতার জন্ম হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করা স্বাভাবিক এবং অনেক সহজ। কিন্তু অপছন্দ ব্যক্তির সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করা কিংবা সেই ব্যক্তিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা আরো কঠিন। কিন্তু মুদিতা ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তি এ কঠিন কাজ খুব সহজেই করতে পারেন। মুদিতা অনুশীলনের জন্য দরকার ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি। মুদিতা দ্বারা শত্র"তাভাব ধ্বংস হয়। মুদিতায় পরের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ অনুরণিত হয়।

৪. উপেক্ষা : উপেক্ষা হলো চতুর্থ ও শেষ মানবিক গুণ যা কোনো ব্যক্তিকে উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে। উপেক্ষা-এর একার্থবোধক শব্দগুলো হলো মধ্যস্ড়ভাব, সাম্য এবং সমচিত্ততা, ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করা, সঠিক উপায়ে পর্যালোচনা করা, অথবা নিরপেক্ষভাবে দেখা, পক্ষে কিংবা বিপক্ষে মোহগ্রস্থ না হওয়া প্রভৃতি। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এ তিন অবস্থা অতিক্রম করে যখন মানুষ অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগত স্পৃহা হন এবং সদাশান্ড় ভাবে অবস্থান করে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় উপেক্ষা। নিরপেক্ষ ভাব বা নিরপেক্ষতা-এর প্রধান লক্ষণ। এ নিরপেক্ষতা হলো আপন সাধনা ও চর্চার কারণে অর্জিত এক স্বভাব বৈশিষ্ট যা চিত্তকে পরহিতে কর্মে স্থিত রাখে নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কোন বিষযে আর্কষণ ও চঞ্চলতা হেতু চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। উপেক্ষার প্রতিপক্ষ হলো লোভ ও হিংসা। এই লোভ ও হিংসা সম্পূর্নরূপে বিনাশ সাধন হলেই 'উপেক্ষা' বোধ হৃদয়ে জাগরিত হয়।

উপসংহার

ব্রহ্মবিহার-এর প্রায়োগিক ব্যবহার মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, এবং উপেক্ষার নিরন্তর অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক অবস্থা উন্নততর নৈতিকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ চারটিকে বলা হয় অপ্রমেয়। এগুলোর সীমা এবং পরিসীমা নেই।

সুতরাং মৈত্রী সকল জীব, করুণা সব দুঃখী, মুদিতা সকল উন্নতিশীল ব্যক্তি এবং উপেক্ষা ভালো-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখী সকল জীবের প্রতি বিস্তৃত এবং প্রসারিত। যিনি নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে মহান গুণাবলীর সাধনা করেন, বিশ্ববাসীর প্রতি প্রীতিবহন করেন, তাদের মঙ্গল কামনা করেন, এ চারটি গুণাবলী কোনোভাবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সীমাবদ্ধ নয়। তাই এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৫.4

এক কথায় উত্তর দিন

১. ব্রহ্মবিহার কী ?
২. ব্রহ্মবিহারের চারটি ধারা কী কী?
৩. ব্রহ্মবিহারের শব্দগত অর্থ কী?
৩. মৈত্রী দ্বারা কাকে জয় করা যায়?
৪. মৈত্রী শব্দের অর্থ কী? ?
৫. করুণা কী?
৬. মুদিতা কী?
৭. উপেক্ষা কী?
৮. মৈত্রীর অনুশীলনে কতটি আনিশংস লাভ হয়?
৯. উপেক্ষার বিপরীত শব্দ কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. ব্রহ্মবিহারের পরিচয় দিন।
২. মৈত্রীর অনুশীলনে অর্জিত আনিশংসসমূহ লিখুন।
৩. মৈত্রীর অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৪. করুণা এবং মুদিতা সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করুন।
৫. উপেক্ষা সম্পর্কে ধারণা দিন।

রচনামূল প্রশ্ন

১. ব্রহ্মবিহারের পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ব্রহ্মবিহারের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

পাঠ-৫ : বৌদ্ধ গৃহী নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি

- গৃহী কারা বলতে পারবেন।
- একজন গৃহীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উৎসাহ কী বলতে পারবেন।
- ধন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- সৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ সম্পর্কে বলতে পরবেন।
- সপ্ত অপরিহানীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সপ্ত অপরিহানীয় নীতির গুরুত্ব বলতে পারবেন।

গৃহীনীতির পরিচয়

বুদ্ধ ছিলেন সর্বমানবের কল্যাণের প্রতীক। তাঁর মতে মানবজীবন পরিপূর্ণ হয় নৈতিক গুণাবলী এবং তার পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে। তার জন্য প্রয়োজন মানুষের সাধনা যেখানে সত- সুন্দর জ্ঞান এবং পান্ডিত্য থাকেবে। এগুলো ছাড়া মানুষ কখনো বড় স্বমহিমায় নিজেকে বিকশিত করতে পারে না। আদর্শ, সমৃদ্ধশালী ও নৈতিক জীবনগঠনে বুদ্ধ তাঁর উপদেশে বিভিন্নভাবে নীতির কথা বলেছেন। এগুলো মানুষকে ইহজন্ম এবং পরজন্মে সুখ-সমৃদ্ধি সর্বোপরি শান্ড়ি আনয়নে সহায়তা করে।

গৃহীর সংজ্ঞা

গৃহে বা আগারে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন-পরিজন নিয়ে বসবাস করে তাদের গৃহী বলে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বললে বলা যায়, যারা সংসারে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করেন তাদেরকে গৃহী বলা হয়। গৃহীরা সচরাচর বিভিন্ন রকম পেশায় নিয়োজিত থাকে। পেশাগুলো হলো : নানাবিধ চাকুরি, ব্যবস্যা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ইত্যাদি ।

গৃহীর দায়িত্ব-কর্তব্য

গৃহীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্ম্পকে বুদ্ধের সুন্দর নীতিকথা রয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে – উৎসাহ, ধন সংরক্ষণ, সৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন, শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ প্রভৃতি।

উৎসাহ : জীবন রক্ষার জন্য যারা অর্পিত কর্মগুলো নিজের শ্রম, সততা, দক্ষতা, জ্ঞান, একাগ্রচিত্ততায় ও কৌশলগতভাবে সুসম্পাদন করে তাকে বলা হয় গৃহী জীবনে উৎসাহ। অর্থাৎ কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকাই হলো উৎসাহ।

ধন সংরক্ষণ : সৎ উপায়ে এবং কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত ধন সম্পদ যেন নষ্ট না হয় সেই দিকে নজর কিংবা লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যকীয়। এ ধন-সম্পদের সংরক্ষণ নিয়ে যারা চিন্ড়া করেন কিংবা যত্নবান হন তারাই উত্তম ধন সংরক্ষক। তার কখনো কোনোরকম আর্থিক সংকটের সন্মুখীন হন না। কোনো রকম দুঃখ-দুর্দশাকে মোকাবেলা করতে হয় না। তাদের ধন সম্পদ নষ্ট হয় না।

সৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ : সৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সৎ লোকের সান্নিধ্যে জীবন সুন্দর হয়, মহান গুণাবলী অর্জিত হয়, পূণ্যবান, দানশীল সর্বোপরি জ্ঞানী এবং পন্ডিত হওয়া যায়। সৎ লাকের সংশ্রবে সবাই মানবিক চিন্ড়া-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং কল্যাণে নিয়োজিত হয়। বৌদ্ধধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকে বলা হয় সৎ লোকের সান্নিধ্য লাভ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন : যে গৃহী সংসারে জীবনে আয় এবং ব্যয় বুঝে টাকা-পয়সা খরচ করেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই জীব নির্বাহ করেন তাকে বলা হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। এখানে উলে- খ থাকে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে গৃহী মিতব্যয়ী হয়।

শ্রদ্ধাগুণ : বৌদ্ধধর্ম মতে, শ্রদ্ধাগুণ বলতে ত্রিরত্নের প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপনকে বোঝায়। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে উলে- খ রয়েছে -চিত্ত বা মনের প্রসন্নতা সাধন ও উৎসাহ উৎপাদনই হলো শ্রদ্ধাগুণ। শ্রদ্ধাগুণের প্রভাবে মানুষ সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি করে অমৃতময় নির্বাণ লাভ করা যায়।

শীলগুণ : গৃহীর জীবন সৎ-সুন্দর নৈতিকগুণে গুণান্বিত করে তোলা দরকার। এ ধরণের অনন্য সাধারণ জীবনগঠনের লক্ষ্যে গৃহীকে শীলগুণ বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধন করতে হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে শীলগুণ সম্পন্ন হতে হলে গৃহীকে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে ; চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে ; ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকতে হবে ; মিথ্যা কথা ভাষণ থেকে বিরত থাকতে হবে ; মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।

উত্তম গৃহীরা সদা সদ্জীবিকার মাধ্যমে জীবন যাপন করে। তারা নানারকম অহিতকর ও অকল্যাণকর ব্যবস্যা থেকে বিরত থাকে। ব্যবস্যাগুলো হলো : অস্ত্র ব্যবস্যা, প্রাণী ব্যবসা, মাংস ব্যবসা, মাদকদ্রব্য ব্যবসা এবং বিষ ব্যবসা। তাছাড়াও তারা

নানারকম অমঙ্গলজনক কর্ম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এতে গৃহীর মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় । তাতে তাঁর উত্তম গৃহী জীবন লাভ হয়।

সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম

এখানে 'সপ্ত' বলতে সাতটিকে বোঝানো হয়েছে। 'অপরিহানীয়' বলতে অবর্জনীয়, ত্যাগ বা পরিহার না করা। আর 'ধর্ম' ধারণ করা। সুতরাং সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম বলতে বোঝায় অবর্জনীয় বা পরিত্যাগ না করা। সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মগুলো হলো যথাক্রমে :

১. যারা সভা সমিতিতে সবসময় একত্রিত হয় তাদের কখনো পরিহানি হয় না ।
২. একতাবদ্ধ হয়ে যারা সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হয় এবং সভা শেষে একত্রে চলে যায়, কোনো প্রকার নতুন করণীয় উপস্থিত হলে সবাই একত্রিত হয়ে সম্পাদন করলে সর্বদা তাদের উন্নতি হয়।
৩. যারা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রকার দুর্নীতি চালু করে না, পূর্বপ্রচলিত সুনীতিও উচ্ছেদ করে না এবং প্রাচীন নীতিগুলো যথাযথভাবে পালন করে চলে তাদের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাদের কখনো পরিহানী হয় না ।
৪. যারা বয়োঃবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা, গৌরব প্রর্দশন করে, সম্মান ও পূজা করে, এবং তাদের আদেশ নির্দেশ পালন করে তাদের সবসময় উন্নতি হয়।
৫. যারা কুলবধু-কুলকুমারীদের জোরপূর্বক কোনো রকম অন্যায় আচরণ করে না, তাদের প্রতি মা এবং বোনের সমমর্যাদা দেখায় তাদের উন্নতি হয়। পরিহানি হয় না কখনো।
৬. যারা চৈত্যেও যথাযথ সংস্কার সাধন করেন, রীতিমিত পূজা অর্চনা করেন এবং সেই চৈত্যগুলোর উদ্দেশ্যে পূর্বপুর ষদের প্রদত্ত সম্পত্তি নিজেরা ভোগ না করে চৈত্য ও বিহার নির্মাণে ব্যয় করেন, তাদের সর্বদা উন্নতি হয়। কখনো অবনতি হয় না।
৭. যারা প্রজ্ঞাবান এবং শীলবান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান দিয়ে সেবা করেন, তাদের সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন, অর্হৎগণের আগমনের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নেন, তাদের কখনো অবনতি হয় না।

সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম বুদ্ধের অন্যতম মূল্যবান উপদেশ। এ রকম সর্বজনীন গুণগুলো অর্জনে মানবজীবন সমৃদ্ধ এবং সার্থক হয়। গৃহীজীবনে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া এগুলোর পরিপালনে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়জীবনেও উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, সৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও সংশ্রবে জীবন সুন্দর ও মহৎ হয়। এতে পুণ্যবান দানশীল ও জ্ঞানী হওয়া যায়। সর্বোপরি মানবজীবনের অপরিমেয় কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং সকলের উচিত সজ্জন,বিদ্বান, পন্ডিত প্রভৃতি সৎ লোকের সংশ্রবে থাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.৫

এক কথায় উত্তর দিন

১. সংসারে যারা বসবাস করে তাদেরকে কী বলা হয়?
২. উৎসাহ কী?
৩. সৎ উপায়ে কী অর্জন করতে হয়?
৪. শ্রদ্ধাগুণ কী?
৫. পঞ্চব্যবসা কী?
৬. সভা-সমিতিতে কেন একত্রিত হয়ে যেতে হয়?
৭. বয়োঃবৃদ্ধদের কী করা উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গৃহীর সংজ্ঞা প্রদান করুন?
২. গৃহীনীতি বলতে কী বোঝেন?
৩. উৎসাহ কাকে বলে?
৪. শীলগুণ বলতে কী বোঝেন?
৫. শ্রদ্ধা কাকে বলে?
৬. সপ্ত অপরিহানীয় নীতি কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ গৃহীনীতি সম্পর্কে আপনার ধারণা লিপিবিদ্ধ করুন।
২. সপ্ত অপরিহানীয় নীতিগুলো বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ–৬ : বৌদ্ধ কর্মবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি

- কর্ম কাকে বলে জানতে পারবেন।
- কর্মের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৌদ্ধ কর্মবাদের স্বরূপ জানতে পারবেন।
- কর্মের শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কর্মের দ্বার-এর স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

কর্মের ধারণা

কর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বই হলো কর্মবাদ। বৌদ্ধ পরিভাষায় 'কর্ম' বলতে কুশল-অকুশল বা ভালো-মন্দ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকেই কর্ম বলা হয়। অর্থাৎ চেতনায় জাগ্রত হলেই তাকে কর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অন্যকথায় বলা যায়, চিত্ত ও চৈতসিকের কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অভিব্যক্তিই কর্ম। সকলপ্রকার কর্ম আগে চিত্তে উৎপন্ন হয়। তারপর কায় সহযোগে তা সংগঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মে কর্মকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম মতে, শুধু কোনো কিছু করাই কর্ম নয়, মন বা চিত্তের চেতনা বা ইচ্ছাকেও কর্ম বলা হয়।

কর্মের উপত্তিস্থল

সাধারণত মানুষের মন বা চিত্ত অস্থির কিংবা চঞ্চল। অস্থির কিংবা চঞ্চল চিত্তে ভাল-মন্দ, কুশল-অকুশল বিভিন্ন চেতনা বা ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এ রকম ভাল-মন্দ, কুশল-অকুশল চেতনা বা ইচ্ছা সমূহ কর্ম নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং চিত্ত বা মনকে সকল কর্মের মূল উৎপত্তিস্থল বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, যে যেমন কর্ম করবে তাকে তার সম্পাদিত স্ব-স্ব কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। বুদ্ধ ত্রিপিটকের অর্ন্তগত অঙ্গুত্তর নিকায় নামক গ্রন্থে বলেছেন– 'চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি'। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! আমি চেতনা বা ইচ্ছাকে কর্ম বলি।

সুতরাং নিজ ইচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্মই বৌদ্ধ মতে কর্ম। যে কর্মে কর্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযুক্তি নাই। অর্থাৎ কর্তার ইচ্ছায় বা জ্ঞাতনুসারে সম্পাদিত হয় না তা কর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমার মনের অজ্ঞাতসারে যদি আমার কর্তৃক মিথ্যাভাষিত হয় এবং বায়ুমন্ডলস্থ অসংখ্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীব আমার অজ্ঞাতসারে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা হত হয়। এমতাবস্থায় সেই মিথ্যাভাষণ এবং প্রাণিহত্যা আমার দ্বারা কৃতকর্ম বলে স্বীকৃতি পাবে না এবং তার জন্য কোনোরকম ফলভোগ করতে হবে না। এখানে বৌদ্ধ মতে কর্মই ধর্ম। কর্মই জীবনের নিয়ন্ড়্র অর্থাৎ জীবন কর্মময়। কর্মক্ষয়ে মানুষ পরম মুক্তি লাভ করতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মে এ পরম মুক্তিকে নির্বাণ বলা হয়।

বৌদ্ধ কর্মবাদ

পৃথিবীর সকল মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ একই রকম নয়। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে মানুষে মানুষে ভিন্নতা প্রসঙ্গের রাজা মিলিন্দ-এর প্রশ্নোত্তরে ভিক্ষু নাগসেন বলেছিলেন ; এগুলো নিজের কর্মের কারণে হয়। কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ রোগী, কেউ নিরোগী, কেউ সুশ্রী, কেউ বিশ্রী, কেউ দুর্বল, কেউ সবল, কেউ ধনী, কেউ ধনহীন, কেউ নীচ, কেউ কুলীন, কেউ জ্ঞানী, কেউ অজ্ঞানী, ইত্যাদি নিজেরই কর্মফল দ্বারা সৃষ্ট। তিনি আরো বলেন ; সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না। কিছু অমবল, কিছু লবণাক্ত, কিছু কটু, কিছু কুলুষযুক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত। এগুলো বীজের নানাত্ব হেতু বা কারণেই হয়। এভাবে কর্মের নানাত্বহেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। বুদ্ধের মতে, এ বিভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম। বৌদ্ধধর্মে এটি-ই কর্মতত্ত্ব কিংবা কর্মবাদ নামে অভিহিত।

কর্মই প্রাণিগণকে হীন-শ্রেষ্ঠ, উচুঁ-নীচু নানাবিধভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ এবং দুঃখের দাতাও কেউ নয়। এগুলো কর্মেরই প্রতিক্রিয়া । বুদ্ধ 'সুত্ত নিপাত' নামক গ্রন্থ বলেছেন–

ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো
কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি, কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো

অর্থাৎ-জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণও হয় না; কর্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা ;
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

অর্থাৎ কর্ম দ্বারা কেউ চাষী হয়, কর্ম দ্বারা কেউ কারিগর (শিল্পী) হয়, কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক এবং কর্ম দ্বারা চাকর হয়।

কম্মুনা বত্ততি লোকো, কম্মুণা বত্ততি পজা
কম্ম নিদ্ধনা সত্তা, রথস্সানীব যাযতো।

অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে সমগ্র জগৎ সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জন্মের সৃষ্টি। চাকার আলোর উপর নির্ভর করে যেমন রথ চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল।

কর্মফল জীবকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে এক অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে। সেই কারণে প্রত্যেককে যে কোনো রকমের কাজ সম্পন্ন করার আগে ভাল-মন্দ, কুশল-অকুশল, শুভ-অশুভ এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে চিন্ড্র করা একান্তই প্রয়োজন রয়েছে।

কর্মের দ্বার

কর্মের দ্বার তিনটি। যথা : ক. কায় দ্বার, খ. বাক্য দ্বার, এবং গ. মন দ্বার। এ তিন দ্বারের মাধ্যমে জীবগণ নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহে নিয়োজিত। তাতে এক মুহূর্তের কোনোরকম বিশ্রাম নেই। কোনো কোনো কর্মে তিনটি দ্বার, কোনোটি কর্মে দুটি দ্বারা আবার কোনো কোনা কর্মে কেবল মাত্র একটি দ্বার একত্রে নিয়োজিত। এ তিন দ্বার দিয়ে সম্পাদিত কর্মের কোনটি শুভ, কোনটি অশুভ আবার কোনটি নিরপেক্ষ। শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ এবং নিরপেক্ষ যে কোনো কর্মই সম্পাদিত হোক না কেন স্ব -স্ব কৃত কর্মের ফল অবশ্যই প্রত্যেককে ভোগ করতে হবে। শুভ বা ভাল কর্ম শুভফল, অশুভ বা মন্দ কর্ম অশুভ ফল এবং নিরপেক্ষ কর্ম নিরপেক্ষ ফল প্রদান করে। শুভ বা ভালকর্মের ফল সুগতিসম্পন্ন এবং অশুভ বা মন্দকর্মের ফল দূর্গতিকারক।

কর্মের শ্রেণী বিভাজন

কর্ম প্রধানত চার প্রকার। যেমন : ক. জনক কর্ম, খ. উপস্ড্রম্ভক কর্ম, গ. উপপীড়ক কর্ম এবং ঘ. উপঘাতক কর্ম।

ক. জনক কর্ম : ইহ জন্মে ও পূর্ববর্তী জন্মে সম্পাদিত কর্মে যে কোনো বিষয় মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্মরণে আসা স্বাভাবিক। বস্তুত বেশী অভ্যস্থ কর্ম সমূহই এ সময় চিত্তের অবলম্বন হয়। এ অবলম্বন বা অবলম্বন কুশল এবং অকুশল যা-ই হোক না কেন এটি পরবর্তী জন্মের মধ্যে প্রভাব ফেলে। এটিই হলো জনক কর্ম।

খ. উপস্ড্রম্ভক কর্ম : জনক কর্মের প্রায় কাছাকাছি একটি কর্ম পর্যায় এটি। 'উপস্তম্ভক' শব্দের অর্থ হলো উপকারী বা সহায়তাকারী। সুতরাং পস্তম্ভক কর্ম' বলতে জীবের জীবিতাবস্থায় উৎপন্ন হয়ে যে পূর্বচেতনা বা জনক কর্মের সহায়তা বা আনুকুল্য বা পরিপোষকতা করে তার ফলোৎপাদনে সাহায্য করে তাকে বোঝায়। এটি কুশল কিংবা অখুশল দুই-ই হতে পারে। কুশল জনককর্মের উপস্তম্ভক অবশ্যই কুশল। অনুরূপভাবে অকুশল জনককর্মের উপস্তম্ভক অকুশল হয়।

গ. উপপীড়ক কর্ম : যে কর্ম চেতনা জনককর্মের অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং উপস্তম্ভক কর্মের সাথে বিরোধিতা করে তাকে উপপীড়ক বা উৎপীড়ক কর্ম বলে। এখানে উপপীড়ক কর্ম অকুশলজনক কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দান করে। উপপীড়ক কর্ম সবসময় জনককর্মের বিপরীতে অবস্থান করে।

ঘ. উপঘাতক কর্ম : এ রকম কর্ম উপপীড়ক কর্মের ন্যায় জনককর্মকে শুধু বাধা প্রদান করে না। সেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কর্মতীব্রতাকে ধ্বংস করে। অজ্ঞাতে ও অতর্কিতে সুবিধানুসারে এ কর্মের সূচনা হয়। প্রবাহমান কর্মের উপর হঠাৎ বাধা সৃষ্টি নতুন কর্মকে প্রতিষ্ঠা করাই উপঘাতক কর্ম।

মানবকূলে সচরাচর সবাই লোভ, দ্বেষ, এবং মোহাসক্ত হয়। অবিদ্যাজনিত কারণে অকুশল প্রবৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে সবাই তিনটি দ্বার দিয়ে নতুন নতুন কর্ম সম্পন্ন করে। ফলে কর্মপ্রবাহ জন্ম-জন্মান্তরে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান থাকে। কর্মপ্রবাহ রোধ করার মধ্য দিয়ে পরম মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। প্রজ্ঞাময় চিত্ত উৎপন্নকরণের মাধ্যমে তৃষ্ণাক্ষয়ে পরম শান্ড়ি নির্বাণ লাভ সম্ভব। তৈল শেষ হলে যেমন বাতির আগুন নিভে যায়, অনুরূপভাবে কর্মক্ষয়ে জীব বারবার জন্মজনিত দুঃখ হতে

মুক্তি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের উক্তি 'যাদের পুরাতন কর্মবীজ ক্ষয় হয়েছে, নতুন কর্ম উৎপন্নের সম্ভাবনা নেই, তাদের পুনর্জন্মের হেতু নেই। সেই কর্মবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত। তৃষ্ণামুক্ত পন্ডিতগণ তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন'।

পরিশেষে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব হল কর্মবাদ। এখানে জীবজগতে মানুষের দৈহিক, মানসিক জন্ম-মৃত্যু, গতি-প্রকৃতি, বৈষম্য ইত্যাদি কর্মজাত। সুতরাং কর্মকে বৌদ্ধধর্মে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবাই কর্মের অধীন। এখানে কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৮.৬

এক কথায় উত্তর দিন

১. বৌদ্ধ পরিভাষায় কর্ম কী?
২. কর্ম কোথায় আগে উৎপন্ন হয়?
৩. মানুষের চিত্তের স্বভাব কী?
৪. কোন ধরনের কর্ম কর্ম নামে অভিহিত হয়?
৫. মানুষ কর্ম অনুসারে কী ভোগ করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কর্মের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২. কর্মে উৎপত্তিস্থলের পরিচয় দিন।
৩. বৌদ্ধকর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।
৪. বৌদ্ধ কর্মবাদের কয়েকটি উদাহরণ দিন।
৫. কর্মের দ্বার সম্পর্কে লিখুন।
৬. বৌদ্ধ কর্মের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন।
২. কর্মের সংজ্ঞা প্রদান করে বৌদ্ধ কর্মের প্রকারভেদের পরিচয় দিন।

পাঠ-৭ : বৌদ্ধ পারমীতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠে শেষে আপনি

- পারমি কাকে বলে জানতে পারবেন।
- পারমির চর্চা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিমির আক্ষরিক অর্থ বলতে পারবেন।
- পারমির উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- পারমির প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

উপক্রমণিকা

বৌদ্ধধর্মের বিবিধতত্ত্বের মধ্যে পারমি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই নিরিখে পারমিসমূহ বা পারমি প্রক্রিয়াকে একটি উন্নত নৈতিকজীবন প্রক্রিয়াও বলা চলে। গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রাণির মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য পারমিসমূহ পূর্ণ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন। এটি জ্ঞান এবং কর্মের সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত ধারা। মন এবং কায় সংযোগে ব্রত বা প্রত্যয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। এ পারমি চর্চা একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া।

পারমির অর্থ

'পারমি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ যা অতিক্রম করে, বা অপেক্ষাকৃত অধিকতর, অগ্রবর্তী বা উৎকৃষ্ট, উর্দ্ধে অথবা নৈতিক পূর্ণতা করেছে, অর্থাৎ পারং + ই। 'যা কোন ব্যক্তিকে অন্য পারে বা তীরে যেতে সহায়তা করে'। অন্যভাবে বলা যায়, বোধি বা 'জ্ঞান' লাভে যা সহায়তা করে। পরম সম্বোধি বা বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভের জন্য পারমি সাধনা অপরিহার্য।

দশ পারমি

বুদ্ধত্ব অর্জনের অভিলাষী বোধিসত্ত্বগণকে দশটি নৈতিক গুণাবলী অনুশীলন করতে হয়। এগুলো পালিভাষায় দশ পারমী বলা হয়। নিচে দশ পারমির সংক্ষিত পরিচয় প্রদান করা হলো :

১. দান পারমী : দান হলো প্রথম পারমী। প্রকৃত অভাবগ্রস্থকে কোন বস্তু দেওয়াকে দান বলা যেতে পারে। তবে এই দান দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সর্তক থাকা বাঞ্চনীয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন দান দেওয়া বিধেয় নয়। সর্বস্ব ত্যাগের মহান ব্রতই হলো দান পারমী। নিজের ধন-সম্পত্তি, পুত্র-কন্যা-স্ত্রী এবং নিজের জীবন পর্যন্ড় দান করার অভিপ্রায় দান পারমির অন্র্ড়াত।

২. শীল পারমী : শীলপালন বোধিসত্ত্বের এক অতি কর্তব্য কর্ম। গৃহীজীবনেও শীল বা নৈতিক বিধান মেনে চলা প্রয়োজন সমাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই। তাই বলা যায়, শীল পারমী নৈতিক দিক দিয়ে, আত্মবলে বলীয়ান কিংবা নীতিবান হওয়ার এক অভিনব পদ্ধতি বিশেষ। অন্যায় ও অসত্য ভাষণ এবং এ রকম অন্যান্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্জনই হলো শীল পারমী।

৩. নৈস্ক্রম্য পারমী : কামাচারে অর্থাৎ অবৈধ যৌন কামাচারে নীরব কিংবা বিরত থাকা। এমন কি সংসার ত্যাগ করে জাগতিক জীবন পরিহার করার ব্রতই হলো নৈস্ক্রম্য পারমী। এটি আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায়ক।

৪. প্রজ্ঞা পারমী : প্রজ্ঞার সাধনা বা জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাই হলো প্রজ্ঞা পারমী। লোকহিতকর জ্ঞান অর্জন করে এর মাধ্যমে জনকল্যাণ বিধান করে প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করতে হয়। সমগ্র সৃষ্টি অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, দুঃখপূর্ণ এবং অনাত্ম বা অহং ভাবশূন্য বলে যিনি প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দর্শন করেন তিনিই কেবল সংসারের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়। এই প্রজ্ঞা তিন প্রকার শ্র“তময় প্রজ্ঞা, চিন্ড়াময় প্রজ্ঞা এবং ভাবনাময় প্রজ্ঞা।

৫. বীর্য পারমী : 'বীর্য' এখানে শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না। 'বীর্য' শব্দের বিশেষ অর্থ হলো মানসিক শক্তি বা চারিত্রিক গুণাবলী। সকল প্রকার জীবের সুখ ও মহাকল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার নামই বীর্য পারমী।

৬. ক্ষান্ড়ি পারমী : সকল প্রকার পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে ক্ষমাশীল হবার নামই ক্ষান্ড়ি পারমী। সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য অনুশীলন করে ক্ষান্ড়ি পারমী পূর্ণ করে সকলের মধ্যে সুন্দর ও সৎ গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৭. সত্য পারমী : প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাকে 'সত্য পারমী' বলা হয়েছে। জীবনের বিনিময়ে হলেও সত্য কথা বলার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার নামই সত্য পারমী।

৮. অধিষ্ঠান পারমী : অধিষ্টান শব্দের অর্থ হলো দৃঢ় সংঙ্কল্প, দৃঢ় চরিত্র, বা দৃঢ় সিদ্ধান্ড়। বস্তুতঃ দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য পারমীসমূহ পূর্ণ হবার নয়। শোক, দুঃখ, ব্যাধি, বিপত্তি সুদৃঢ় সঙ্কল্পকে টলাতে পারে না কখনো। সৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে জীবনপণ করে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার নামই অধিষ্ঠার পারমী।

৯. মৈত্রী পারমী : মৈত্রীর বৌদ্ধধর্মে এক বিশেষ স্থান করে আছে। সকল জীব সত্ত্বার প্রতি অপরিমেয় মায়া-মমতা, ভালবাসা, করুণা এবং মমত্ববোধ জাগ্রত রাখাই হলো মৈত্রী পারমী। পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

১০. উপেক্ষা পারমী : অভীপ্সা পূরণে আনন্দিত ও অপূরণে দুঃখিত না হয়ে চিত্তের সাম্যভাবে বজায় রাখার অনুশীলন রীতিকে উপেক্ষা পারমী বলা হয়।

পারমীর গুরুত্ব

উপর্যুক্ত দশটি আচরণীয় পারমী তিন পর্যায়ে সর্বমোট ত্রিশটি স্ড়রে পালিত হয়। এ তিন পর্যায় হলো স্বভাবগত পর্যাযে, অঙ্গীকারবদ্ধ পর্যায়ে এবং চরম অঙ্গীকার বা পণবদ্ধ পর্যায়ে। এটি একটি অনুশীলন তত্ত্ব । এ তত্ত্বের গুর"ত্ব অনুধাবন হয় জীবনচর্যার মাধ্যমে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মনের উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য এ পারমিসমূহ অনুশীলনযোগ্য। সর্বজনীনভাবে এ ধারা কিংবা প্রক্রিয়াকে বিচার করলে এটিকে একটি অনন্য জীবনধারা বা বিশুদ্ধজীবন চর্যাও বলা যায়। পারমিসমূহ চর্চার মাধ্যমে মানুষের সাংসারিক, সামাজিক, রাষ্টীয় এবং সর্বোপরি ব্রহ্মচর্য জীবনেও চর্চা করলে এর প্রত্যক্ষফল লাভ করা সম্ভব। সেগুলো হলো : ক. মহত্ব (Generosity) খ. নৈতিকতা (Morality) গ. সহিষ্ণুতা (Patience), ঘ. দৃঢ়তা (Vigour), ঙ. মনোযোগিতা (Concentration), এবং পান্ডিত্য (Wisdom) ইত্যাদি। মূলত এগুলো প্রকৃত অর্থে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অনন্য সম্পদ। সুতরাং সমাজজীবনে এ পারমিসমূহের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উপসংহার

পারমী সাধনা ও সদ্ধর্ম আচার অত্যন্ড় উপযোগী এবং কল্যাণময়ী। শান্তি, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব কিংবা ভ্রাতৃত্ববোধের উৎকর্ষতায় ব্যক্তি জীবনে পারমীর ভূমিকা অনন্য সাধারণ। একজন যথার্থভাবে পারমী পালনকারীর চেতনার মূল্যবোধ সমাজে অন্যকে অনেকাংশে নৈতিকতায় উজ্জীবিত করে। পারমী সাধনার শুভ চিন্তার ফল বা অধিষ্ঠান-ব্রতের কৃতধারার ফল কখনো বৃথা যায় না। এটি ইহকাল-পরকালে সর্বোপরি সর্বকালেই কল্যাণময়ী এবং সর্বত্রই মঙ্গলময়ী যা শুদ্ধতম জীবনাচারে অন্যতম এক অধ্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৮.৭

এককথায় উত্তর দিন

১. পারমী অর্থ কী?
২. বুদ্ধ কী পূর্ণ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছিল?
৩. পারমিসমূহ কী কী?
৪. দান পারমী কী?
৫. প্রজ্ঞা কত প্রকার ?
৬. ক্ষান্ড়ি শব্দের অর্থ কী?
৭. অধিষ্ঠান শব্দের উত্তর কী ?
৮. সাম্যভাব বজায় রাখার অনুশীলকে কী বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. পারমিসমূহের পচিয় দিন।
২. দশ পারমিসমূহ বিস্তারিত লিখুন।
৩. পারমির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. প্রজ্ঞা এবং বীর্য পারমির বিবরণ দিন।
৫. আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায়ক পারমী সম্পর্কে লিখুন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পারমী সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।
২. দশবিধ পারমির আলোচনা করুন।

পাঠ-৮ : নির্বাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি

- নির্বাণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- নির্বাণ সম্পর্কিত বুদ্ধবচন বলতে পারবেন।
- নির্বাণ বিষয়ে বিভিন্ন পন্ডিতদের মতামত বলতে পারবেন।
- নির্বাণের শ্রেণী বিভাজন বলতে পারবেন।
- নির্বাণের স্বভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নির্বাণের স্বরূপ বলতে পারবেন।
- নির্বাণ লাভের উপায় বলতে পারবেন।

নির্বাণ

বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য পরম মুক্তি বা নির্বাণ। এখানে 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ নিভে যাওয়া কিংবা নির্বাপিত হওয়া। অর্থাৎ ভবচক্র বা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি থেকে চিরমুক্তি। তৃষ্ণা বা কামনার বশবর্তী হয়ে জীব বারবার জন্মগ্রহণ করে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করে। এ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারলেই দুঃখ নিরোধ হয়। জগৎ সংসারে দুঃখ থেকে যিনি মুক্ত তিনি নির্বাণগামী। সুতরাং তৃষ্ণাক্ষয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপী দুঃখময় ভবচক্র থেকে চিরমুক্তি নামই নির্বাণ।

নির্বাণের সংজ্ঞা

'নি' উপসর্গের সাথে 'বাণ' পদযুক্ত হয়ে নির্বাণ শব্দটি গঠিত হয়। এখানে 'নি' মানে নিঃশেষ বা ক্ষয় আর 'বাণ' হল বন্ধন বা তৃষ্ণা। অতএব নির্বাণের সাধারণ অর্থ নির্বাপিত হওয়াকে বোঝালেও বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের অর্থ হলো তৃষ্ণার ক্ষয় বা বন্ধনমুক্তি। বৌদ্ধ মতে, জন্ম-মৃত্যু'র ভবচক্র বলা হয়। এ ভবচক্র থেকে মুক্ত হতে না পারলে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে না কখনো। তাই ভবচক্র থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে দুঃখের পরিপূর্ণ নিবৃত্তির নামই হলো 'নির্বাণ'।

নির্বাণ সম্পর্কিত বুদ্ধবচন

'নির্বাণ' সহজবোধ্য নয়। তাই বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিকট সরাসরি নির্বাণের কোনরকম ব্যাখ্যা তুলে ধরেননি। এ নির্বাণ সম্পর্কিত কয়েকটি গাথা নীচে প্রদান করা হলো :

ক. বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন তণ্হাকং বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খং হোতি চেতসো।

অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিভে যাওয়ার ন্যায় তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান নিরোধের দ্বারা বিমুক্ত পুরুষের চিত্ত মোক্ষ (নির্বাণ) লাভ করে। তাঁর পুনর্জন্ম সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়।

খ. যো ইমস্মিং ধম্মবিনযো অপ্পমত্তো বিহেস্সতি
পহায জাতি সংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতী'তি।

অর্থাৎ বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্ম বিনয়ে যিনি বিচরণ করেন সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তি ভবচক্র অতিক্রম করে সকল দুঃখের অন্তসাধন করেন।

গ. নত্থি সমো অগ্গি।
অর্থাৎ - রাগের সমান অগ্নি নেই।

এখানে বুদ্ধ তৃষ্ণাক্ষয়, বিজ্ঞান, অগ্নি (রাগ) নিরোধের দ্বারা সংসার সাগর নামক অন্তহীন দুঃখ থেকে চিরমুক্তিকেই নির্বাণ বলে অভিহিত করেছেন।

বিভিন্ন পন্ডিতদের অভিমত

মহাকবি অশ্বঘোষ 'সৌন্দরানন্দ' নামক কাব্যে এ নির্বাণ সর্ম্পকে বলেন ; নির্বাপিত প্রদীপের শিখা মাঠিতে প্রবেশ করে না, আকাশে ও গমন করে না, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোথাও গমন করে না, কেবল মাত্র স্নেহ পদার্থের ক্ষয়হেতু যেখানে প্রদীপ জ্বলছিল সেখানেই নিভে যায়।

ঠিক সেই রকম সাধক নির্বাণ লাভ করতে গেলে ভূগর্ভে প্রবেশ করে না, আকাশেও গমন করে না, কোন দিগ্ দেশেও যায় না, কেবল মাত্র কলুষরাশি ক্ষয় হওয়ার জন্য যেখানে তাঁর জীবনধারা প্রবাহিত ছিল, সেখানেই চিরতরে শান্ড় হয়ে থাকেন।

আচার্য নাগার্জুন 'মজ্ঝিম সুত্তে' উলে- খ করেছেন : ভবসন্ড়তির উচ্ছেদই হলো নির্বাণ। এখানে ভবসন্ততি বলতে ভব সংস্কারকে তিনি বুঝিয়েছেন। ভব সংস্কারের কারণে মানুষ বাররার জন্মগ্রহণ করে এ সংসারে এবং সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। সুতরাং এ জন্মজনিত দুঃখের নিরোধই হলো নির্বাণ।

আচার্য শান্ড়িদেব মনে করেন ; সর্বত্যাগই দুঃখ। এখানে তাঁর মতে, সুখ-দুঃখ, পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ এবং অহং বোধ অর্থাৎ আমিত্ববোধের ধারণা থেকে মুক্তি বলতে সর্বত্যাগকে বোঝানো হয়েছে। এ নির্বাণ সম্পর্কিত আরো অসংখ্য অভিমত রয়েছে। এগুলো বিশে- ষণে দেখা যায় নির্বাণ হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। সকলপ্রকার লোভ-দ্বেষ-মোহ, কাম-লালসা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তির বিনাশ সাধনই হলো নির্বাণ।

সাধারণ অর্থে নির্বাণ বলতে নিভে যাওয়াকে বোঝায়। বৌদ্ধদর্শন মতে, তৃষ্ণা বা বন্ধনজনিত মুক্তি অর্থে নির্বাণের প্রায়োগিক ব্যবহার রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, তৃষ্ণাক্ষয় বা বিজ্ঞান রোধের দ্বারা ভবচক্র নামক অন্ড়হীন দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই হলো নির্বাণ।

প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ হলো পঞ্চস্কন্ধের চির অবসান। চিত্তবৃত্তি বা তৃষ্ণার কারণেই মৃত্যুর পর পঞ্চস্কন্ধ পুনঃবার সংগঠিত হয়। আবার জন্ম বা পুনর্জন্ম হয়। এভাবে চেতনা ও তৃষ্ণার কারণে সকলজীবকে বার বার জন্ম নিতে হচ্ছে। পরম সুখ ভেবে পুনবার দুঃখকে আলিঙ্গন করতে হচ্ছে। সেই জীবন প্রবাহ কিংবা জীবন স্রোতের সম্পূর্ণ ছেদকেই নির্বাণ বলে।

তেল শেষ হলে যেমন প্রদীপ প্রজ্বলিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে সেই রকম মনের আবিলতা কিংবা অন্ড়রের মলিনভাব পরিষ্কার হয়ে যায়, লোভ, দ্বেষ এবং মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে গমনা-গমন বা জন্ম-মৃত্যুরও অবসান হয়। এ সময় কর্মপ্রবাহ থেমে যায়। কর্মের প্রধান উৎস চিত্ত-চৈতিসিক স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি, অনাগামি এবং অরহৎ সাধনার চার স্ড়রে ক্রমে উন্নীত হয়ে নির্বাণ লাভকামী জাগতিক জীবনের আশা-আকাঙক্ষা, ভোগ-ত্যাগ, নিন্দা-প্রশংসা, যশ-অযশ ইত্যাদিতে উপেক্ষাভাব অর্জন করেছে। অতএব চিত্তপ্রবৃত্তির বিনাশের কারণে কর্মফলেরও বিনাশ হয়েছে। তাই জন্মও নিরুদ্ধ হয়েছে। এটিই নির্বাণ।

নির্বাণের প্রকারভেদ

ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে নির্বাণ দুপ্রকার বলে উলি- খিত হয়েছে। যথা :

ক. সোপাদিশেষ নির্বাণ এবং খ. অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

ক. সোপাদিশেষ নির্বাণ : পঞ্চস্কন্ধের বিরাজমানতায় যদি সকল প্রকার তৃষ্ণার অবসান হয়ে, কেউ স্থিতভাবে অবস্থান করতে পারে সেই অবস্থাকে সোপাদিশেষ নির্বাণ বলে। এখানে বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় তাঁর ভবচক্র নিরুদ্ধ করে। বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় এ রকম লাভকৃত নির্বাণই হলো সোপাদিশেষ নির্বাণ।

খ. অনুপাদিশেষ নির্বাণ : পঞ্চ উপাদান স্কন্ধরূপ দেহত্যাগ করে যে নির্বাণ অর্জিত হয় তখন তাকে অনুপাদিশেষ নির্বাণ বলা হয়। এটাকে আবার নিরুপাদিশেষ নির্বাণও বলা হয়।

গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভের পর তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সকলের হিতার্থে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আশি বছর বয়সে কুশীনগরের জোড়াশাল বৃক্ষের নীচে পরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের এ পরিনির্বাণ লাভই হলো অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

নির্বাণের স্বভাব

নির্বাণকে দেখা যায় না। এটাকে উপলব্ধি করা যায়। নির্বাণ পরম শান্ড়িময়। সর্বপ্রকার দুঃখের উপশমতাই হলো নির্বাণের স্বভাব। নির্বাণ উপলব্ধি খুবই কঠিন। এটি উপলব্ধি করতে হলে দরকার অভিধর্মে যথার্থ জ্ঞান। কারণ স্কন্ধ, আয়তন, ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞপ্তি, চিত্ত ও চৈতসিক ইত্যাদির সাথে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও প্রতিসন্ধি চিত্ত এবং সেই সাথে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্পর্কে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞান না থাকলে নির্বাণ বিষয়ে অস্পষ্টতা থেকে যায়। জন্ম নিতে পারে নানাবিধ শঙ্কা। এ প্রসঙ্গে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে দেখা যায় - আকাশ যেমন জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেউ হরণ করতে পারে না, এটি অনাশ্রিত-অবাধ-বিহগ গমনের অনুকূল, আবরণহীন অনন্ত সেরূপ নির্বাণও জন্মে না, জীর্ণ হয় না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেউ হরণ করতে পারে না, লুট করতে পারে না, অনাশ্রিত, সাধুদের গমনযোগ্য, নিবারণ ও অনন্ড়।

নির্বাণের স্বরূপ

নির্বাণের স্বরূপকে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। একেবারে দুর্বোধ্য। জীব এবং জড় জগতের সবই পরিবর্তনশীল। এখানে অপরিবর্তনীয় কিছুই নেই। জড় এবং জীব জগতের এ পরিবর্তনশীলতা বৌদ্ধধর্ম মতে, সুখকর নয় বরং দুঃখই এ আসল রূপ। মানুষের দেহ এবং মন এগুলো কখনো স্থির নয়। সর্বদা চঞ্চল।

জীব এবং জড় জগতের সকল বস্তুই দুপ্রকার। একটি হল সংস্কৃত এবং অপরটি অসংস্কৃত। যে সব বস্তু (জড়-জীব) সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং কার্যকারণের অর্ন্তগত সেগুলো হলো সংস্কৃত। আর হেতু বা কার্যকারণ রহিত বস্তুই হলো অসংস্কৃত। নির্বাণ অসংস্কৃত। কেননা এটির কার্যকারণ নেই। নির্বাণ অপরিবর্তনীয়, শান্ত এবং শাশ্বত। বস্তুর অস্থায়ীত্ব কিংবা

পরিবর্তনশীলতা দুঃখকর। কিন্তু নৈর্বাণিক আনন্দ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর। এ পৃথিবীতে যে সমস্ত বিষয় মানুষের দৃষ্টিগোচর, অদৃশ্য বা কল্পনার অতীত তার মধ্যে নির্বাণকে বৌদ্ধধর্মে সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ কর্তৃক উপস্থাপিত নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে নাগসেন স্থবির বলেন– 'নির্বাণ অনির্বচনীয়, তুলনাহীন। স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি প্রমাণ কিংবা প্রমাণ দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। তবে নির্বাণ শান্ত এবং পরম সুখদায়ক।

নির্বাণ লাভের উপায়

নির্বাণ লাভ করা খুবই কষ্টকর। তবে সাধ্যাতীত নয়। বুদ্ধ এ বিষয়ে বলেছেন –

আরোগ্যা পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং
বিস্সায পরমা ঞাতী, নিব্বানং পরমং সুখং।

অর্থাৎ আরোগ্য পরম প্রাপ্তি, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বস্ত ব্যক্তি পরম আত্মীয় এবং নির্বাণ পরম সুখ। এখানে বুদ্ধ নির্বাণকে পরমসুখ বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষ তার ঐকান্তিক সাধনাবলে এ সুখ অর্জন করতে পারে। নির্বাণ লাভ সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন –

নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স, পঞ্ঞা নত্থি অঝাযতো
যম্হি ঝানং পঞ্ঞা চ সবে নিব্বান সন্তিকে।

অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাবান নয় তার ধ্যান হয় না। ধ্যানহীন ব্যক্তির প্রজ্ঞা হয় না। যে ব্যক্তির ধ্যান এবং প্রজ্ঞা দুই-ই আছে তিনি নির্বাণর সমীপবর্তী।

সুতরাং নির্বাণ লাভ করতে হলে শীলবান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রথমে সাধনা দ্বারা রাগ-দ্বেষ-মোহ ইত্যাদিকে জয় করতে হবে। এভাবে নিরূপদ্রব, নির্ভয়, নিস্পৃহ ও কল্যাণময়ী হয়ে নির্বাণ কি তা উপলব্দি করেন। নির্বাণকে যথাযথভাবে অনুভব করতে পারলে তা লাভ করার উপায়ও নির্ণয় কর সম্ভব। বুদ্ধ শাসনে স্থিত ব্যক্তি চতুরার্য সত্যর উপলব্দি এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের যথার্থ অনুশীলনের দ্বারা নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ড় করতে সক্ষম হন। জন্ম-জন্মান্ড়রের কুশল কর্মের প্রভাব থাকাও চাই। সুকর্মের সুফল দ্বারা নির্বাণ লাভ হয় আবার অন্যদিকে কুকর্মের কুফল হেতু নির্বাণ সাক্ষাৎ তো দূরের কথা বরং জন্মান্ড়রে অশেষ দুঃখ ভোগ করে।

উপসংহার

নির্বাণকে বিবৃতি দিয়ে বোঝানোর বিষয় নয়। এটা উপলব্ধি এবং অনুভবের বিষয়। দৃশ্যমান কোন বস্তু বা পদার্থ নয় বলেই এটাকে কল্পনায় অনুমান করা যায়। সর্ব জাগতিক বিষয় বর্জন ও তার বিরাগ ও নিরোধ। এক কথায়, নির্বাণ শান্ত, অনির্বচনীয় পরমার্থ চিত্ত বিমুক্তি ও পুনর্জন্ম নিরোধক।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৮.৮

এক কথায় উত্তর দিন

১. নির্বাণ শব্দের অর্থ কী?
২. মানুষ কেন জন্ম গ্রহণ করে?
৩. কারা ভবচক্র অতিক্রম করে?
৪. কিসের সমান অগ্নি নেই?
৫. নির্বাণ কত প্রকার ও কী কী ?
৬. চিত্তের স্বভাব কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. নির্বাণের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২. নির্বাণ সম্পর্কিত কয়েকটি গাথা বাংলায় লিখুন।
৩. নির্বাণ সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিতদের দুটি অভিমত লিখুন।
৪. সোপদিশেষ নির্বাণ কী?
৫. অনুপাদিশেষ নির্বাণ কী?
৬. নির্বাণের স্বভাব কেমন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নির্বাণ বলতে কী বোঝেন? বিভিন্ন পন্ডিতদের মতামত উল্লেখ করে নির্বাণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
২. নির্বাণ কত প্রকার ও কী কী? নির্বাণের স্বভাব এবং স্বরূপ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

পাঠ-৯ : বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বুদ্ধসমকালীন প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থা সর্ম্পকে সাধারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুদ্ধসমকালীন ভারতের ধর্মীয় অবস্থা সর্ম্পকে জানতে পারবেন।
- সম্রাট অশোকের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষক হিসেবে সম্রাট কনিষ্কের ভূমিকা সর্ম্পকে জানতে পারবেন।
- পালযুগে বৌদ্ধরাজাদর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উনিশ শতক থেকে একবিংশ শতকের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করতে পারবেন।

সূচনা

মহামতি গৌতম বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শত বছর পূর্বে জাতীয় জীবনের বিশেষ এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার এক চরম বির্পযয় দেখা দিয়েছিল। এ সময় বুদ্ধের জন্ম ও তাঁর ধর্ম প্রচার তৎসমকালীন ভারতীয় চিন্তাধারায় আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে অনেক রাজা-শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বুদ্ধের সমকালীন থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ড় এ ভাবধারা বিরাজমান ছিল।

প্রাক্ বৌদ্ধযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

সামাজিক অবস্থা

বুদ্ধ সমকালীন ভারতে বর্ণ-ব্যবস্থা খুবই চরম আকার ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র - এ চারটি বর্ণই সমাজজীবনকে বিপর্যস্ড় করে তুলেছিল। পরবর্তী কালে এ বর্ণ প্রথাই কঠোর জাতিভেদের জন্ম দেয়। এক কথায় এ ধরনের প্রথাই ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে প্রায় পঙ্গু করে তোলে। এ যুগে ব্রাহ্মণদের প্রবল আধিপত্য ছিল। তারা সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতেন এবং অপর দিকে শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ ও পৌরহিত্য করতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ বিদ্যায় সিদ্ধ হস্ড় ছিলেন। রাজ্য পরিচালনায় তারা কৃতিত্ব অর্জন করতেন। বৈশ্যরা করতেন কৃষি কাজ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। শূদ্ররা সমাজের নিচু স্ড়রে অবস্থান করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থকতো। তাই শূদ্রের কপালে জুটতো অবজ্ঞা, অবহেলা ও লাঞ্চনা জাতিভেদ প্রথা জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রাহ্মণেরা অহংকারী ও আরাম প্রিয় হয়ে উঠলেন। বৈশ্যরা বাণিজ্যে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পুষ্ট হলেন। ভোগ-বিলাস ও সুখভোগে কালযাপন করতেন তারা। নারীদেরও সামাজিক মর্যাদা তেমন ভাল ছিল না।

ধর্মীয় অবস্থা

সে যুগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে দেশ আচ্ছাদিত ছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মীয় প্রচার অভিযান বৃদ্ধি করল। ধর্মের নামে যজ্ঞ হতো, আর সেখানে পশুরক্তে রঞ্জিত হত সেই যজ্ঞ। ধর্ম যাজকরা যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করতে লাগলেন। অন্যদিকে ইহ-পরকালের অপরিমেয় সুখ ও শান্ড়ির বানী প্রচার করলেন বুদ্ধ। আশ্রম জীবনের চারটি ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। ব্রহ্মচর্য জীবনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুগৃহে কাটাতে হতো। গার্হস্থ্যজীবন ছিল সংসারজীবন পালন করা। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বাস করতে হতো। আশ্রম জীবন ছিল সন্ন্যাসব্রত। সন্ন্যাসীরা মোক্ষ ও শান্ড়ি অনুসন্ধান করতেন। ছয় জন তৈর্থিক তাঁদের বিসদৃশ ধর্ম মতবাদ প্রচার করছেন। এ ছয়জন তৈর্থিক হলেন যথাক্রমে – পুরাণ কাশ্যপ, মোগ্গলী গোশাল, নিগ্রন্থ নাথপুত্র, অজিত কেশকম্বল, পকুধ কাত্যায়ান ও সঞ্জয়বেলট্টি পুত্র। এদের কেউ বলতেন প্রাণি হত্যা, চুরি,মিথ্যা বললে পাপ হয় না। কেউ সুখ-দুঃখের কারণ বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন মোক্ষ লাভ করার জন্য বহুবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। আবার অন্যজন অজ্ঞানবাদে বিশ্বাস করতেন ধর্মকে কেউ দ্বৈত অর্থবোধক হিসেবে প্রচার করতেন। নিগ্রন্থনাথ পুত্র যিনি মহাবীর নামেই সমধিক পরিচিতি ছিলেন। তিনি কর্মফলের উপর জোড় দিতেন। এভাবে ধর্মীয় জীবনে চলছিল বহুমত ও পথের ব্যবহার। এ সময় সাধারণ মানুষ সঠিক ধর্ম কোনটি তা সহজে বেছে নিতে পারল না।

বুদ্ধের সমকাল : রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি

বুদ্ধের সমকালে প্রাচীন ভারতে ষোলটি জনপদ ছিল এগুলো 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে পরিচিত। এ রাজ্যগুলো নানা ধারায় শাসিত হতো। কোশল ও মগধ সর্ব বৃহৎরাজ্য ছিল। এগুলো স্থানীয় শাসক দ্বারা শাসিত হতো। তারা তাদেরকে কর দিত। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়ের সমন্বয়ে রাজ্য পরিচালনা করা হতো। শাক্যজাতি তাদের স্বজাতীয় প্রধানকে রাজা হিসেবে

নির্বাচন করতেন। বৃজি জাতি ছিলেন অত্যন্ড় শক্তিশালী একটি জাতি। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও একতার দরুন মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শংকিত থাকতেন। বৃজিরা আটটি গোত্র থেকে আটজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে রাজ্যশাসন ও বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ও উজ্জয়নী রাজ চন্দ্রপ্রদ্যেৎ অনেকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে।

বুদ্ধের সময় কালে যে ক'জন শ্রেষ্ঠী বা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনাথপিন্ডিক এবং ধনঞ্জয় অন্যতম ছিলেন। অনেক সময় রাজা আর্থিক সহায়তার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। কপিলাবস্তু, কৌশাম্বী, উজ্জয়নী, তক্ষশীলা, গান্ধার, শ্রাবস্ড়ী, রাজগৃহ, বৈশালী, প্রভৃতি নগরীগুলো ছির সমৃদ্ধশালী। তক্ষশীলার খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। প্রজারা সামন্ড়রাজাদের কর দিতেন। অন্যদিকে সামন্ড় রাজারা তাঁদের আয়ের একটা অংশ ঊর্দ্ধতন রাজাদের নিকট প্রদান করতেন।

বৌদ্ধধর্মে প্রচার -প্রসার

বুদ্ধ বারাণসীর ইসিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট তাঁর প্রবর্তিত নবধর্ম সর্বপ্রথম প্রচার করেন। এ সময় রাজগৃহের বিখ্যাত ধনী যশ প্রমুখ ৫৯ জন গৃহী বুদ্ধের ধর্মবাণী শুনে তাঁর ধর্মে দীক্ষা নেন। এদের নিয়েই সর্ব প্রথম সংঘ গঠিত হয়। তাঁরা ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় উরুবিল্বের কাশ্যপ নামক এক অগ্নি উপাসক তার ভাই এক হাজার শিষ্য নিয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এতে বুদ্ধের নব ধর্মের প্রতি সাধারণ জনগণের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। রাজণ্যবর্গের মধ্যে বারাণসীর মগধরাজ বিম্বিসার সবার আগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বিম্বিসারের অনুপ্রেরণায় সংঘের অনেক নিয়মকানুন মগধের রাজধানী রাজগৃহের বেণুবনে বুদ্ধের অবস্থানের সময় বিধিবদ্ধ হয় বুদ্ধের বর্ষাবাসের জন্য রাজা বিম্বিসার বেণুবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। প্রথমে তিনি আজীবক ধর্মের অনুসারী হলেও পরবর্তীতে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। তিনিও বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। রাজাকারাম বিহার প্রতিষ্ঠা তাঁর অবদান। অবন্ড়ীর রাজা চন্দ্রপ্রদোৎ মহাকাত্যায়ন স্থবিরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টায় অবন্ড়ী বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ভিক্ষু পিন্ডোল ভারদ্বাজের নিকট বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহ এবং শ্রাবস্ড়ীর পরেই কৌশাম্বীর স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিক এবং শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়-এর নাম কোন অংশে কম নয়। তাছাড়া বুদ্ধের জন্য জেতবন বিহার মহাবিহার নির্মাণের কাহিনী অত্যন্ড় চমকপ্রদ। মহা-উপাসিকা বুদ্ধের প্রতি খুবই শ্রদ্ধশীল ছিলেন। রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীদের উদারতা, সহায়তা সর্বোপরি পৃষ্টপোষকতায় বৌদ্ধধর্মে প্রচার-প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের ইতিহাসে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়।

মৌর্য যুগ

মৌর্য যুগকে বৌদ্ধধর্মে ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। কথিত আছে, মৌর্যবংশের দ্বিতীয় সম্রাট বিন্দুসার-এর মহাপ্রয়াণ হলে তার একশত পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। এ সংঘর্ষকে কলিঙ্গ যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়।এ সংঘর্ষে অশোক তাঁর বৈমাত্রীয় নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আসীন হন। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে তাঁর মনের মধ্যে এক বৈপ- বিক পরিবর্তন আসে। এ সময় নিগ্রোধ শ্রামণের নিকট বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিনি এ ধর্মের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মনীতি অনুসারে আদর্শ জীবনযাপনের উপর অত্যাধিক জোর দেন। ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে একটি ধর্ম প্রচারক পরিষদ নিয়োগ করে বিভিন্ন জনপদে প্রেরণ করেন। লোকশিক্ষা ও ধর্মবাণীগুলো পর্বতগাত্রে, প্রস্তরস্তম্ভে ও গুহায় খোদিত করেন। এগুলো অশোক স্তম্ভ নামে খ্যাত।

ভিক্ষুসংঘের মতানৈক্যে নিরসনে তিনি পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে এক বৌদ্ধ সংগীতি আহবান করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি তৃতীয় সংগীতি নামে অভিহিত। তবে বলা যায়, তাঁর পৃষ্টপোষকতায় বৌদ্ধধর্মে প্রচার-প্রসার যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল অন্যকোন রাজার আমলে তা হয়নি।

কুষাণ যুগ

মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব থাকলেও শুঙ্গবংশের সময়ে কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তবে আশার কথা কুষাণ যুগে সে ধারা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। কনিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ট নরাধিপতি। তিনি ভিক্ষু পার্শ্বের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর ধর্মগুরু পার্শ্বের পরামর্শ অনুযায়ী জরন্ধরে একটি বৌদ্ধ সংগীতি আহবান করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি চতুর্থ সংগীতি নামে অভিহিত। এ সংগীতির মধ্য দিয়ে মহাযান ধর্ম মতবাদের উৎপত্তি হল। তাছাড়া সমগ্র ত্রিপিটকও সংস্কৃতভাষায় সংকলিত হয়।

সম্রাট কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তাঁর অর্থায়নে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের জন্য পেশোয়ারে একটি বিহার নির্মিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি কনিষ্ক মহাবিহার নামে পরিচিত। অশ্বঘোষ, পার্শ্ব, বসুবন্ধু, বসুমিত্র, নার্গাজুন দিঙনাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণ তাঁর সার্বিক সহযোগিতা এবং আনুকূল্যতা লাভ করেন। সংগীতি শেষে তিনি নেপাল, তিব্বত, চীন মঙ্গেলিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক পরিষদ প্রেরণ করেন। তাঁর ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টায় সেই সময় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পায়।

পালযুগ

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে পালরজাদের অবদান উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজমান। বৌদ্ধধর্মে প্রচার এবং প্রসারে গোপাল এবং ধর্মপালের ভূমিকা অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। গোপাল ৭৪০ শতাব্দীতে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর রাজত্ব গ্রহণের বছরেই তিনি ওদন্তপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলিন তিনি। বৌদ্ধধর্মের নৈতিক শিক্ষা আয়ত্ব করা তাঁর জীবনে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পিতার ন্যায় ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধনে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনিই পাল রাজাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ উপাধি 'পরমেশ্বর', 'পরম ভট্টরক, মহারাজাধিরাজ প্রাপ্ত হন। ভাগলপুরের ২৪ মাইল উত্তরে তিনি বিক্রমশীল স্থানের নামানুসারে বিক্রমশীল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে সোমপুর বিহার নামে আর একটি বিহার নির্মাণ করেন। প্রাচীন ভারতে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল এটি। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য অসংখ্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল তাঁর পুণ্যশীলা মাতা রন্নাদেবীর সহায়তায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেবের অনুরোধে তিনি নালন্দা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। সে গ্রামগুলো হলো যথাক্রমে : নন্দীবনাক, মনিবায়ক, নারিকা, হস্ড্রাম, এবং গয়ার পালামর গ্রাম। নালন্দা বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ড় ব্যয়ভার এ গ্রামগুলোর উপস্বত্ব থেকে নির্বাহ করা হতো। বাংলাদেশের উজ্জ্বল জোতিষ্ক খড়গবংশীয় রাজ কুমার ভিক্ষু শীলভদ্র এবং বিশ্বনন্দিত পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রাচীন নালন্দা মহাবিহারের আচার্য ছিলেন। রাজা ধর্মপাল বাংলার সাথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ দেশসমূহের সৌভ্রাতৃত্বময় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। পাল রাজত্বকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং প্রসারের যুগ বলা হয়। নিচে পালরাজাদের সময়কাল তুলে ধরা হলো :

রাজার নাম	সিংহাসনে আরোহণের কাল(আনু)	রাজত্ব কাল(আনু)
প্রথম-গোপাল	৭৫০	২০ বৎসর
ধর্মপাল	৭৭৫ – ৮১০	৩৫ বৎসর
দেবপাল	৮১০ – ৮৪৭	৩৭ বৎসর
১ম সূরপাল	৮৪৭ – ৮৬০	১২ বৎসর
১ম বিগ্রহপাল	৮৬০ – ৮৬১	১ বৎসর
নারায়ণ পাল	৮৬১ – ৯১৭	৫৫ বৎসর
রাজ্যপাল	৯১৭ – ৯৫২	৩৫ বৎসর
২য় গোপাল	৯৫২ – ৯৭২	২০ বৎসর
১ম মহীপাল	৯৭২ – ৯৭৭	৫ বৎসর
২য় বিগ্রহ পাল	৯৭৭ – ১০২৭	৫০ বৎসর
নয়পাল	১০২৭ – ১০৪৩	১৫ বৎসর
৩য় বিগ্রহ পাল	১০৪৩ – ১০৭০	২৬ বৎসর
২য় মহীপাল	১০৭০ – ১০৭১	১ বৎসর
২য় সূরপাল	১০৭১ – ১০৭২	২ বৎসর
রামপাল	১০৭২ – ১১২৬	৫৩ বৎসর
কুমারপাল	১১২৬ – ১১২৮	২ বৎসর
৩য় গোবিন্দ পাল	১১২৮ –১১৪৩	১৫ বৎসর
মদন পাল	১১৪৩ – ১১৬১	১৮ বৎসর

গোবিন্দ পাল	১১৬১ – ১১৬৫	৪ বৎসর

আধুনিক যুগ

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব জাগরণের সূত্রপাত হয়। এ সময়ে আধুনিক বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের নবোত্থান শুরু হয়। বাংলাদেশের বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বড়ুয়া, মুৎসুদ্দী, তালুকদার, চৌধুরী, সিংহ, চাক্‌মা, মারমা, তঞ্চঙ্গা, চাক, খেয়াং, খীসা এবং উত্তরবঙ্গের ওরাও উপাধিধারীরা সবাই বৌদ্ধ। বাংলাদশের বৌদ্ধরা মূলত দুভাগে বিভাজিত। যথা : সমতলের বৌদ্ধ এবং পাবর্ত্য অঞ্চলের আদিবাসী বৌদ্ধ। তাছাড়া সমতলের উত্তরবঙ্গের বিছু এলাকায় এবং পটুয়াখালি অঞ্চলে আদিবাসী বৌদ্ধরা বসবাস করে।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ড় বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাস ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত। আবার অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস বিশে- ষণ করলে দেখা যায় যে, সে সময় বৌদ্ধসমাজ খুব বেশী উন্নত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম এ সময় অনেক পরিবর্তনের সন্মুখীন হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ তাদের জীবনযাত্রায় এবং আচার-আচরণে বৌদ্ধ বিনয়ের নিয়মনীতি তেমন পরিপালন করতেন না। বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধ মতবাদ থেকে সরে গিয়ে তন্ত্র-মন্ত্রকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মীয় লক্ষী পূজা, স্বরস্বতী পূজা, শনি পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়। বাংলায় তেমন বৌদ্ধদের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল না। এমতাবস্থায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যাদৃষ্টিকে পরিহার করে বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠায় আরাকান থেকে এগিয়ে আসলেন সারমেধ মহাথের। তিনি সারমিত্র মহাস্থবির নামে অত্যধিক পরিচিত। উল্লেখ থাকে যে, তিনি ১৮৫৬ খ্রি. আরাকান (বর্তমান মায়ানমার-এর একটি প্রদেশ) থেকে চট্টগ্রাম হয়ে তীর্থ দর্শনে ভারত যাচ্ছিলেন। এ যাত্রা পথে তিনি কয়েকদিন চট্টগ্রাম অবস্থান করেন। অবস্থান কালে তিনি ভিক্ষু এবং গৃহীদের অবৌদ্ধিক কর্মকান্ড দেখে চিন্ড়িত হন। অনুরূপভাবে চন্দ্র মোহন মহাস্থবিরও কলকাতায় বৌদ্ধধর্ম বিনয় শিক্ষা করে চট্টগ্রাম ফিরে এসে বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যার অনুভব করেন। আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবির এ সময় মায়ানমারের মান্দালয় এবং শ্রীলংকায় ধর্ম বিনয়শিক্ষা করে চট্টগ্রামে ফিরে এসে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় শুরু হয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মহামুনি, সাতবাড়িয়া এবং হারভাং -এ তিনটি মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের সাধারণ শিক্ষার অগ্রগতিতে বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ উনবিংশ শতকে প্রারম্ভ থেকেই এ দেশের বৌদ্ধরা বিশ্বের বৌদ্ধদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং বিশ্ব বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

বিংশ শতক থেকে বৌদ্ধরা ধর্মচর্চা, সমাজউন্নয়ন, শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, ব্যবসায় সর্বোপরি সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসে সততা-নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৮.৯

এক কথায় উত্তর দিন

১. প্রাচীন ভারতে বর্ণব্যবস্থা কেমন ছিল?
২. ধর্মের নামে কী হতো?
৩. প্রচীন ভারতের নামে কী?
৪. অনাথপিন্ডিক কে ছিলেন?
৫. মৌর্য যুগকে কী বলা হয়?
৬. কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ নরপতির নাম কি?
৭. ধর্মপালের পিতার নাম কি?
৮. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয় কোন শতককে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাক্ বৌদ্ধযুগ বলতে আপনি কী বোঝেন?
২. বুদ্ধ সমকালীন অবস্থায় প্রাচীন ভারতের অবস্থা কেমন ছিল?

৩. বুদ্ধ কোথায় এবং কাদের প্রথম ধর্মপ্রচার করেন?
৪. সম্রাট অশোক কে ছিলেন?
৫. তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি কালে রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
৬. সম্রাট কনিষ্ক কে ছিলেন?
৭. বিক্রমশীল বিহার কার নামে করা হয়?
৮. প্রাচীন ভারতে সর্ববৃহৎ বিহারের নাম কী?
৯. কোন সময়কে আধুনিক বৌদ্ধধর্মে পুনরুত্থানের সময় বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাক্ বৌদ্ধযুগের সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২. বুদ্ধের সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখুন।
৩. মৌর্য এবং কুষাণ যুগে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করুন।
৪. পালযুগে বৌদ্ধ রাজাদের অবদান কেমন ছিল -আলোচনা করুন।
৫. আধুনিক যুগের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ একটি ধারণা প্রদান করুন।